অন্তরঙ্গ

অন্তরঙ্গ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সিগনেট প্রেস কলকাতা ২০
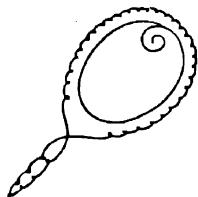
অণুভা, অণুভা—নামটা যেন ভয়ানক চেনা মনে হচ্ছে। পৃথিবীতে এমন এক-একটা নাম আছে যে শোনা মাত্রই মনে হয়, একে আমি চিনি : না চিনি তো, একে আমার নিতান্তই চেনবার কথা।

অথচ শত চেষ্টা করেও তার নাম-ধাম তুমি কিছু মনে করতে পারবে না।

'আমার মেয়ে, অণুভা,' ভদ্রলোক ইচ্ছে করেই একটু থামলেন : 'গেলো-বছর ইংরিজিতে যে ফার্স্ট-ক্লাশ অনার্স পেয়েছিল—'

হবে। তেমনি করেই শুনে থাকবে হয়তো। হিমাদ্রি নির্লিপ্ত একটু হাসল।

'তাকে একবারটি আপনার দেখতে যেতে হবে।'

কোন ধরনের দেখা, হিমাদ্রি কিছু চট করে বুঝে উঠতে পারল না। তার ইউরোপ থেকে ফিরে আসার পর একজাতীয় দেখার জন্যে মেয়ে-মহল থেকে প্রায়ই তার নিমন্ত্রণ আসত, কিন্তু কোনোটাই যেন এমন অনাবৃত রূঢ় শোনায়নি। উদ্যোগ নেই, একেবারে উদ্ঘাটন। এক ঘর লোকের সামনে হিমাদ্রি হঠাৎ সঙ্কুচিত হয়ে গেল। তবু নিষ্কম্প, মসৃণ গলায় সে একবার জিগগেস করলে: 'কী হয়েছে?'

'আর বলবেন না,' ভদ্রলোক হতাশ গলায় বললেন, 'আজকালকার মেয়ে—মেয়ে তো নয়, মাছের কাঁটা। গলায় আছে বিঁধে। গেলাও যায় না, ফেলাও যায় না। ঝঞ্ঝাট—ঝঞ্ঝাটের একশেষ।'

সন্দেহে হিমাদ্রির মুখ ঘোরাল হয়ে উঠল। গলাটা ঈষৎ নামিয়ে এনে বললে, 'কোনো অসুখ?'

'অসুখ না হাতি!' ভদ্রলোক বিরক্তিতে কুঞ্চিত হয়ে বললেন, 'ফ্যাশান, বুঝতে পাচ্ছেন না, বিদেশী

সাহিত্যের ঢেউ। শেলি-কীট্সের ছোঁয়াচ। এত সব পড়া-শোনা হল, ডঙ্কা মেরে এতগুলি বয়েস ডিঙিয়ে গেল একধার থেকে, বুঝতে পাচ্ছেন না, এর পর খানিকটা আর রঙ্গ না করলে মানাবে কেন? ষোলো কলা পূর্ণ হওয়া তো চাই! প্রাণে-মানে শেষ তো করবেই, খরচেও একেবারে নিঃশেষ তলিয়ে দিয়ে যাবে।'

'কী হয়েছে তাই বলুন না,' হিমাদ্রি অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

'কী আবার হবে! হিস্টিরিয়া—এই বয়েসে মেয়ে-দের আর এ ছাড়া এক কথায় কী হতে পারে?'

'হিস্টিবিয়া?' এতটা যেন হিমাদ্রি আশা করতে পারত না।

'তা ছাড়া তাকে আর আপনি কী বলতে পারেন?' ভদ্রলোক শুকনো, শীর্ণ মুখে বললেন, 'নইলে সব সময়ে এই ওজন কমছে, এই জ্বব-জ্বর কবছে, এই বুঝি হার্ট-ফেল করে গেল—মনের এই স্যাঁতসেঁতে বিলাসিতাকে শুদ্ধ ভাষায় তবে আর কী বলা যায়?'

হিমাদ্রির দুই চোখ সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল : 'ঘুষঘুষে জ্বর ? কখন আসে ?'

ভদ্রলোকের মুখে এতটুকু একটা রেখা ফুটল না, কথাটাকে উড়িয়ে দেবার মতো করে বললেন, 'বিকেলের দিকে হয়তো, কিন্তু সকালবেলা গায়ে হাত দিয়ে দেখেছি পাথরের মতো ঠাণ্ডা। ও-সব আর কিছু নয়, বুঝলেন না, মনের ধোকা, একটুখানি সস্তা প্রসাধন।'

'রাত্রে ঘাম হয় ?'

'ওর তো আর নিজের মা নেই বেঁচে যে সব সময়ে কাছে বসে পাহারা দেবে! আমাকে যা একাধটু বলে মাঝে-মাঝে, তারই একটা শুধু খসড়া দিচ্ছি—তারপর আজ যা বললে—'

'কাশি আছে ?'

'তা, সংসারে কোন লোকটা না কাশে বলুন ? এই তো সেবার সমানে সাত রাত আমি কাশলুম, কাশতে-কাশতে গলা ছিঁড়ে রক্ত পর্যন্ত বেরুলো,' ভদ্রলোক বিরক্তিতে একটা মুখভঙ্গি করলেন :

'কই, কোনোদিন তো একটা ডাক্তার কখনো ডেকে পাঠালুম না। বুঝলেন না, আজকালকার মেয়েদের ধরন-ধারণই আলাদা।'

হিমাদ্রি একটুও চমকাল না, কথা একটা বলতে হবে বলেই যেন বললে, 'গলা দিয়ে রক্তও পড়ছে নাকি ?'

চেয়ারের গায়ে পিঠটা ছেড়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'তাই তো আপনার কাছে আসা। কিন্তু আমি জোর করে বলতে পারি, ও-রক্ত কিছু আর ওর ফুসফুস থেকে আসছে না। ওর দাঁত খারাপ, দাঁতের যন্ত্রণায় এই সেদিনও ও ভীষণ চেঁচিয়েছিল মনে পড়ছে। তা, আমি দেখিনি মশাই নিজ চোখে, শোনা কথা। সকালবেলা, কেমন আছে জানতে একবারটি ওর ঘরে গেলুম, গিয়ে দেখি কিনা চেয়ারে বসে দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কী ব্যাপার ? আদরের ঘটা দেখুন একবার মেয়ের,' ভদ্রলোক বিজ্ঞের মতো গভীর অবজ্ঞা নিয়ে বললেন, 'বলে কিনা কাল রাতে কাশতে-কাশতে মুখ দিয়ে

তার রক্ত উঠেছে। বলে আমাকে একটা রুমাল দেখালে। ধমকে উঠলুম, বললুম: তোর দাঁত খারাপ না? এ তারই রক্ত। মেয়ে তা শোনবারই মেয়ে নয়। কান্না, কেবল কান্না—আর কাঁদতে-কাঁদতে কাশি। বুঝলেন না, আমাকে ডাক্তারের এখানে পাঠিয়ে তবে ছাড়লে। আর বলেন কেন, আরেকটা নতুনরকম ফ্যাশানের খরচ যোগাও! জ্বালাতনের একশেষ।'

ঘরের মধ্যে থেকে কে একজন লোক ঈষৎ ঝাঁজালো গলায় বলে উঠল: 'একে আপনি হিস্টিরিয়া বলতে চান?'

'আবার কী!' ভদ্রলোক মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'ডাক্তারি ছুটো ধমক খেলেই কাঁধ থেকে ব্যারামের ভূত আলগোছে কখন নেমে যাবে দেখবেন।'

.হিমাদ্রি নম্র, স্নিগ্ধ মুখে বললে, 'আমাকে যেতে বলছেন?'

'হ্যাঁ, বা রে, তারই জন্যে তো আসা। শুনতে পাই এ সব বিষয়ে আপনি নাকি একজন পাকা

স্পেশ্যালিস্ট। বিলেত থেকে অনেক সব ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন। বুঝলেন না, আপনাকে যদি নিয়ে যেতে পারি,' ভদ্রলোক কাতর একটা মুখভঙ্গি করে বললেন, 'মেয়ের আর তাহলে কিছু অভিযোগ করবার থাকবে না। আর আপনি যদি সাহস করে জোর গলায় একবার বলে দিয়ে আসতে পারেন : ও কিছু নয়, মনের একটা ভুল—তাহলেই আর ওর পালাবার পথ থাকবে না, জ্বরো গায়ে তক্ষুনি ওর ঘাম দেবে।'

পাশেই হিমাদ্রির য়্যাসিস্ট্যাণ্ট দাঁড়িয়ে ছিল, তীক্ষ্ণ একটু হেসে বললে, 'কিন্তু, সত্যি করে বলতে, উনি তো হিস্টিরিয়ার স্পেশ্যালিস্ট নন।'

'আরে মশাই, ও একই কথা।' ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে বললেন, 'ব্যারামে শরীরের চেয়ে মনই মানুষের বেশি ভোগে। সে-মনকে যদি ঠিক শাসন করা যায়, তা হলেই আদ্ধেক আরোগ্য। আমাদের মতো লে ম্যানের কথায় কি ও-সব শিক্ষিত মেয়ের মন ওঠে?'

ডাক্তারি পরিভাষায় য়্যাসিস্টাণ্ট কী বলতে যাচ্ছিল,

হিমাদ্রি তাকে বাধা দিয়ে বললে, 'যাব। আপনার বাড়ির ঠিকানাটা—' পকেট হাতড়ে ছোট ডায়রিটা সে বার করলে।

ভদ্রলোক কথাটার পাশ কাটিয়ে গেলেন। বললেন, 'আচ্ছা, শৈলেশকে আপনার মনে পড়ে?'

হিমাদ্রি কলমের ডগায় যেন একটা হোঁচট খেল: 'কে শৈলেশ?'

'কলেজে আপনার সঙ্গে পড়ত, সিক্স্থ্-ইয়ার পর্যন্ত পড়েছিল,' ভদ্রলোকের গলা কেমন হঠাৎ আচ্ছন্ন হয়ে এল: 'শৈলেশ মজুমদার।'

'বা, শৈলেশকে চিনি না?' হিমাদ্রি ভদ্রলোকের মুখের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল: 'আপনার সে কে হয়?'

'আমার ছেলে।'

'ও! নমস্কার!' উত্তপ্ত উৎসাহিত গলায় হিমাদ্রি বললে, 'আপনিই তবে সেই বনমালীবাবু? কি আশ্চর্য! শৈলেশ—শৈলেশ এখন কোথায়? কতদিন তাকে দেখি না।'

'আর তাকে কোনোদিন দেখবে না, বাবা।'

'বলেন কী!' হিমাদ্রি এক নিমেষে নিজেকে যেন অত্যন্ত ছোট, দুর্বল বলে অনুভব করলে।

'আর কীই বা তোমাকে বলব, বল।' বনমালীবাবু ভারি, ঘোলাটে গলায় বললেন, 'আমার সেই রাজপুত্রের মতো ছেলে। তারপর বহু কষ্টে মেয়েটাকে এই দাঁড় করিয়েছিলুম—তা, সে-ও কিনা শখ করে লম্বা বিছানা নিলে। তোমাকে আমি ঠিক দিব্যি গেলে বলে দিতে পারি হিমাদ্রি, ও-সব হচ্ছে হালি মেয়েদের রঙচঙে ফ্যাশান, বই থেকে কুড়িয়ে-পাওয়া হালকা একটা কবিতার সুর, মনের একটা কোমল কাতরানি। তুমি যদি, বাবা, মেয়েটাকে একটু অভয় দিয়ে আসতে পার, তাহলেই ও ঠাণ্ডা হয়ে ঘুমোতে পারে, বুড়ো বয়েসে আমিও এই হয়রানি থেকে রেহাই পাই।'

'আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, এগারোটার মধ্যে।' শরীরের জড়ীভূত ক্লান্তি সরিয়ে হিমাদ্রি উঠে দাঁড়াল : 'কিন্তু আপনার ঠিকানাটা বললেন না?'

'ঠিকানা,' বনমালীবাবু বিস্মিত হবার সামান্য একটু ভান করলেন : 'তুমি তো আমাদের বাড়িতে দু-একবার যেন গেছলে মনে হচ্ছে।'

'গিয়েছি নাকি ?' হিমাদ্রি কুণ্ঠিত একটু হাসলো : 'কিন্তু, আশ্চর্য, কিছু এখন মনে পড়ছে না তো।'

'তবে লিখে নাও।' বনমালীবাবু যেন প্রায় রাগ করেই ঠিকানাটা বলে গেলেন। পর মুহূর্তেই ফের প্রায় অপরাধীর মতো মুখ করে জিগগেস করলেন : 'তোমার ফি-টি কত ?'

'সে হবে এখন, তার জন্যে আপনি ভাববেন না।' হিমাদ্রি সমস্ত শরীরে ক্ষিপ্র একটা ব্যস্ততার ভঙ্গি করলে।

ঘর-ভরা এখনো অনেক রোগী, অনেক সব তাদের আবদার আর অভিযোগ, কিন্তু, বলতে কি, সেই মুহূর্তে কেউই তার কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় বলে মনে হল না। কেননা অগণিত এই রোগীর জনতার মধ্যে কারুরই যক্ষ্মা হয়নি। প্রত্যেকে এরা অসম্পৃক্ত একেকটা ব্যক্তি, কেউ একটা স্থূল, সম্পূর্ণ বিষয় নয়,

তার মনের মতো বিষয়, তার এতদিনকার সাধনার জিনিস।

এতদিনে হিমাদ্রির জীবনে নতুন একটি দিন এসেছে।

বলতে কি, ইউরোপ গিয়েছিল সে এই যক্ষ্মারই প্রতিষেধক খুঁজতে। কত দেশ, কত হাসপাতাল, কত গবেষণা, কিন্তু বলতে অবিশ্যি বাধা নেই, নামের পেছনে অতিকায় কতগুলি ডিগ্রির সমাবেশ ছাড়া কোনো সার্থকতাই সে অর্জন করতে পারেনি—নির্দিষ্ট, নির্ভুল কোনো একটা 'স্পেসিফিক্'। তবু এই রোগ, যাতে প্রতি বছর এক ভারতবর্ষেই চারলক্ষ লোক অবলীলায় মারা পড়ছে, যার ঝাপটায় এ পর্যন্ত পৃথিবীর বিশাল জনারণ্যের এক-সপ্তমাংশই গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে—সেই রোগই ছিল তার জীবনের প্রধান আকর্ষণ—মধ্যসমুদ্রে নাবিকের যেমন ধ্রুব-তারা। তারই বিরুদ্ধে তার যুদ্ধায়োজনের সূচনা। কোখ্-এর আবিষ্কৃত সেই আণবিকতম ব্যাসিলাস্, দুর্ধর্ষ ও দুর্দাম, সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে যার

অভিযান পড়ছে ছড়িয়ে—যেখানে স্তূপীভূত ক্ষয়ের নামান্তর হচ্ছে সভ্যতা—সেই রোগ, রুগ্ন সেই সভ্যতার বিরুদ্ধে হিমাদ্রি তার সমস্ত শক্তি, সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত অর্থ একত্র সম্মিলিত করেছে। তাই, কারু যক্ষ্মা হয়েছে—এটা এই হিসেবেই তার কাছে একটা প্রকাণ্ড শুভসংবাদ, যে, তাকে তার ভালো করতে হবে।

তাকে তার ভালো করতে হবে। কোথাকার কে-একটি মেয়ে, ভীরু ও ভঙ্গুর, শীর্ণ ও স্তিমিত, ক্লান্ত ও করুণ—কিছুই তাতে তার এসে যায় না, কিন্তু তার যক্ষ্মা হয়েছে—এতেই সে হিমাদ্রির কাছে এক মুহূর্তে অসীম মূল্যবান হয়ে উঠল। সে তার কাছে বিশেষ কোনো একটা ব্যক্তি নয়, বহির্ভূত একটা বিষয়, জ্যোতিষীর কাছে যেমন নক্ষত্র, ঠিক কতকটা জ্যামিতির প্রতিপাদনের মতো। কেননা তার যক্ষ্মা হয়েছে তাই সে হিমাদ্রির নিকটতম আত্মীয়, কেননা তার সর্বাঙ্গে এখন মলিন ক্ষীণায়মানতা তাই সে দুঃস্পৃশ সুন্দর, কেননা সে আসন্নমৃত্যুসম্ভবা তাই সে

পৃথিবীতে সবাইর চেয়ে মহার্ঘ। অথচ তাকে কিনা এখনো হিমাদ্রি দেখেনি!

হাতে তার আরো কতোগুলি 'কল্' ছিল, কিন্তু কোনোটাই যেন ডাক নয়, কেননা কেউই এমন মৃত্যুকে শিয়রে নিয়ে বসেনি। আর-সবাই ভালো হতেও পারে, না-ও হতে পারে—তাদের মাঝে কতকটা আশা ও কতকটা দুর্ঘটনা, তাদের আরোগ্য বা মৃত্যু নিতান্তই একটা নিষ্প্রাণ প্রাত্যহিকতা। কিন্তু এ একেবারে ভালো হবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে, মৃত্যু তার জীবনে সরল একটা রেখার মতো নির্ধারিত, তার অবসীদমান চোখের উপরে ভ্রূলতার মতো স্থির, ঘন, নির্ভুল; তাই একে বাঁচানোই হচ্ছে একটা ঘটনা, পৃথিবীতে একে জায়গা করে দেওয়াই মানে পৃথিবীকে বড় করে দেওয়া।

এ-রুগী ও-রুগী দেখে হিমাদ্রির এগারোটা আর বাজে না।

বাইরে থেকে বাড়ির চেহারা দেখেই হিমাদ্রির বুঝে নিতে দেরি হল না শৈলেশেরও মৃত্যুর কী কারণ

ছিল। আকাশে কোথায় যে সূর্য উঠেছে এ-গলিতে ঢুকে তার হিসেবে হঠাৎ ভুল হয়ে যায়। অলক্ষিত কোন দুরন্ত মুহূর্তে বাতাস একদিন এখানে ভুল করে ঢুকে পড়েছিল, কিন্তু বেরিয়ে যাবার পথ পায়নি— তারই একটা মৃত, বিবর্ণ ভার সমস্ত শূন্য আচ্ছন্ন করে পড়ে রয়েছে। এখানে একবার রাত্রি এলে কী করে যে তার অন্ধকার আবার অদৃশ্য হয় সেইটেই যেন হিমাদ্রির কাছে বিশাল একটা বিস্ময় বলে মনে হল। পৃথিবীতে কোথাও যে আদিগন্ত নিরন্তরাল মাঠ আছে, কোথাও যে নিরবকাশ আকাশের নগ্নতা, কোথাও যে সমুদ্রের সমুচ্ছ্বসিত মুক্তি—এ যেন এখানে দাঁড়িয়ে সশরীরে বিশ্বাস করা যায় না।

মোটরের হর্ন শুনে, বনমালীবাবু কাছেই কোথাও অপেক্ষা করছিলেন, দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এলেন।

'এস, এই দিকে।'

দেয়াল দিয়ে টুকরো-করা ছোট-ছোট ফোকর। নিচেটা বনমালীবাবুদের নয়, আরেক বাসাড়ে নিয়েছে। নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে হিমাদ্রি

উঠতে লাগল। না, ও-পাশটাও অন্য এলাকায়, তার মানে, উত্তরের অংশটা তাঁর, যেখানে রৌদ্রের একটি রেখাও এসে পৌঁছোয় না। দেয়ালে হাত ঠেকাতে পর্যন্ত ভয় করে, এমন ঠাণ্ডা, বিবর্ণ চেহারা; মেঝেটা যেন পায়ের নিচে বসে-বসে যাচ্ছে এমন পিছল স্যাঁতসেঁতে। হিমাদ্রির জন্যে বাতাস যেন এখানে হঠাৎ এক নিশ্বাসেই ফুরিয়ে গেছে এমনি একটা ভারি, ভয়ার্ত আবহাওয়া। রুমালে মুখ ঢেকে ছোট গলায় একবার সে কাশলো এবং তখুনি তার সন্দেহ হল, মুখের থেকে রুমাল সরিয়ে নিতেই সেখানে সে নির্ঘাত রক্তের ছিটে দেখতে পাবে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই ডাইনে ঘর। সেটা যে রুগীর, আন্দাজ করে নেওয়া কঠিন নয়, যদিও ঘরের মধ্যে রাজ্যের আসবাব, যা-নয়-তাই টুকিটাকি। কিন্তু, আশ্চর্য, তক্তপোশের উপর পাতা বিছানায় রুগীর কোনো চিহ্ন নেই।

‘অণু কোথায় গেলি?’ বনমালীবাবু ঘর পেরিয়ে উত্তরের বারান্দায় চলে এলেন; ‘এই যে এখানে

উঠে এসেছিস। তা হলে শরীরটা এখন বেশ ভালো লাগছে!'

তাঁকে অনুসরণ করে হিমাদ্রিও চলে এলো।

ফালি সরু একটা বারান্দা, পুবের দিক থেকে রোদের খানিকটা ঝাঁজ পাওয়া যাচ্ছে মাত্র। সমস্ত বাড়িটা এখানে এসে যেন একটুখানি হাঁপ ছেড়েছে। গলির বিসর্পিল ভঙ্গির শেষ প্রান্তটা এখান থেকে ঝাপসা দেখা যায়। টুকরো-টুকরো যাওয়া-আসার ঢেউ।

পুরোনো বেতের বাঁকানো একটা ঢালু চেয়ারে একটি মেয়ে কোমল কাতরতায় আধখানা হয়ে শুয়ে আছে। নোয়ানো হাঁটুর উপরে উপুড়-করা পাতা খোলা একটা বই, সে-বইয়ের বিরাট অর্থহীনতা মেয়েটির দুই চোখে অস্পষ্ট কুহেলিকার মতো যেন দুলছে। এ মেয়েটি কে এবং কী এর অসুখ, বুঝতে হিমাদ্রির এক মিনিটও দেরি হল না। কিন্তু আশ্চর্য, হঠাৎ তার কাছে সমস্ত বাড়ি যেন কেমন অত্যন্ত পরিচিত মনে হল, মনে হল একে যেন কোথায়

সে আগে দেখেছে। হবে, থার্ড-ইয়ারে পড়তে শৈলেশের কাছে কোনো ছুতোয় সে এসে থাকবে হয়তো, পরীক্ষার আগে দুজনে তারা এক সঙ্গে বসে পরামর্শ করে পড়া করতো—তেমনি কোনো একটা সন্ধ্যায় হয়তো চা ও খাবার হাতে করে সে ঘরে ঢুকেছিল, হ্যাঁ, মনে পড়ছে, আর টেবিলের উপর জিনিস কটা নামিয়ে রেখেই সে এই বারান্দা দিয়েই পলকা পায়ে প্রজাপতির মতো কাঁপতে-কাঁপতে উড়ে পালিয়েছিল। গুনে দেখতে গেলে সন্ধ্যা হয়তো কেবল একটাই নয়। আর, শৈলেশের বাড়ি পড়া করতে এসে কোনোদিন যে সে চা না খেয়ে ফিরেছে এমন অসম্ভব কথা তো তার মনে পড়ছে না। কিন্তু সে-সে দিন অপস্রিয়মাণ একটি কিশোরীর চকিতোদ্ভাসিত একটু লজ্জা ছাড়া সে আর কী দেখেছিল ? দ্রুত, দীপ্ত, দীর্ঘ একটি গতির ছুরিকা। কলহসিত, তির্যক একটি নির্ঝরিণী। তার বেশি কিছুই সে মেয়েটির জানেনি, না বা নাম, না বা তার মুখর একটু মধুরতা, তবু সে-সে দিন

তার মনে হয়েছিল, হাড়-মাস-স্নায়ু-শিরার নীরস বিশ্লেষণের মাঝে মনে হয়েছিল, মেয়েটি যেন মৃতপত্র অরণ্যে বসন্তের বিদারণ, খানিকটা যেন মাঝরাতের অন্ধকারের মধ্যে ঘুম থেকে জেগে-ওঠার মতো। স্বাস্থ্যে উছলে পড়ছে একটি মেয়ে, গতির পিচ্ছিলতায় ছিটিয়ে পড়ছে তার লীলায়িত কটি রেখা, পলায়মান দিগন্তের মতো রহস্যে সব সময় সবুজ—হায়, আয়ুর্বেদীয় অভিধানে তার বিন্দুতম কোনো ব্যাখ্যা ছিল না। কিন্তু কে জানে এই সেই কিনা। কিছু এসে যায় না, বলতে গেলে, হিমাদ্রি অণুভাকে এই প্রথম দেখল। এই তার প্রথম উন্মোচন, সমর্পিত প্রশান্তি। যদি সে-ই হয়ে থাকে, তাতেই বা কী এসে যায়? তার জন্যে হিমাদ্রিকে শোক করতে বল? কণিকতম একটি মুহূর্ত হিমাদ্রি অণুভার বিশাল, ভাসমান দুটি চক্ষুর বিশ্রান্ত ব্যথার দিকে চেয়ে রইল; তার সেদিনের উদ্বেল ও উদ্বৃত্ত স্বাস্থ্য আর নেই বটে, কিন্তু সত্যি করে বল, সেদিন নিশ্চয়ই তার এত রূপ ছিল না। মৃত্যুপথযাত্রিণীর

এই মহিমা। নিবে যাবার আগে আগুনের এই নবীন বর্ণচ্ছটা।

ততটুকুই শুধু নয়। হিমাদ্রির এখন আস্তে-আস্তে আবছা করে আরো কিছু কথা যেন মনে পড়ছে। মনে পড়ছে তার বাবা তার বিলেত যাবার আগে বিয়ের জন্যে একটা মেয়েলি বায়না ধরেছিলেন, নাটকীয়তার কাছাকাছি। কথাটা উড়িয়ে দিতে হিমাদ্রির অবিশ্যি একটা কথাও তখন বলতে হয়নি, সে এত ব্যস্ত। কিন্তু মত বল বা মন বল, সমস্ত কিছু সমানে অগ্রাহ্য করে বাবা আশে-পাশে আবোলতাবোল মেয়ে দেখে ফিরছিলেন। আশ্চর্য, তারই এক ফাঁকে শৈলেশ তাকে লুকিয়ে তাদের বাড়িতে এনে থাকবে হয়তো। কেননা এবার যে পাত্রীটিকে তিনি পছন্দ করে বাড়ি ফিরলেন, স্পষ্ট মনে পড়ছে, সে ততো একটা কিছু সুন্দরী বলে নয় সে শৈলেশের বোন বলে, আর শৈলেশরা নির্দয় গরিব বলে। কী বিবেচনায় যে কাকে বিয়ে করতে হবে বাবার মতো হিমাদ্রিও কিছু কূল পাচ্ছিল না।

তাই সে সটান সমুদ্রেই ভেসে পড়েছিল। সমুদ্রের লোনা জলে স্মৃতির সমস্ত রেখা এখন মুছে গেছে।

কোনো কথা জিগগেস করাও যেন অবান্তর, হিমাদ্রি প্রথম দৃষ্টিপাতেই আনুপূর্বিক বুঝতে পেরেছে হ্যাঁ, সন্দেহ নেই, যক্ষ্মা। আর সেই যক্ষ্মা যে তার হাড়ে নয়, গ্ল্যাণ্ডে নয়, ফুসফুসে, তার শরীরের বিশীর্ণ পাণ্ডুরতায় তা স্পষ্ট লেখা আছে। বুকের শুষ্কায়িত সঙ্কুচন থেকেই তা বোঝা যায়। দু-কাঁধের অসমানু-পাতিক সংস্থাপন থেকেই তা ধরা পড়ে ; বাঁ দিকের কাঁধটা কেমন ঢিলে হয়ে নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে। বহুকালের পুরানো হাতির দাঁতের মতো হারিদ্রশুভ্র তার চামড়া, পাতলা, ফিকে নিষ্প্রভ। চুলে নেই সেই ঘনতার জ্যোতি, চোখের পালকগুলি স্বল্প, কুঞ্চিত ; সন্ত্যধৃত আরণ্য পশুর মতো চোখের কি-রকম খিন্ন, ক্ষুধার্ত দৃষ্টি। বিধুর, বিবর্ণ একটি দুর্বলতায় মেয়েটি যেন অত্যন্ত নিরীহ, অত্যন্ত একাকী। তবু, কিছু যেন তার হয়নি, এমনি সানন্দ অভিবাদনের সুরে হিমাদ্রি জিগগেস করল : 'কি হয়েছে আপনার ?'

অণুভা পুলকিত বিস্ময়ে চোখ তুলল, এবং সেই মুহূর্তে তার যে সত্যি কী হয়েছে সে কিছু ভেবে পেল না।

বুঝল, বুঝতে যেন তার এতটুকু বেগ পেতে হল না, বাবা এত দিনে সজাগ হয়ে তার জন্যে ডাক্তার নিয়ে এসেছেন। কিন্তু আগন্তুক যে সামান্য একজন ডাক্তার, মূর্তিমান একটা যান্ত্রিক উদ্ভাবন, এ যেন অণুভা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইল না। যেন তার শীতার্ত, বিমর্ষ ঘরে এক ঝলক রোদ এসে পড়েছে, এখান থেকে যে-আকাশ শুধু কল্পনায় দেখা যায় তারই নীল, নির্মুক্ত অজস্রতা। দৃঢ়তায় উচ্চারিত তার শরীর, স্বাস্থ্যে সমুদ্ধত, দৃপ্তিতে দীর্ঘকায়, এ যেন তার ঘরে কোন ধন্বন্তরির অভ্যুদয় হল, হাতে তার বিশল্যকরণী। তার উপস্থিতিটাই যেন একটা অবিশ্বাস্য বিস্ময়।

একটু ভয়ে, হয়তো বা তার বাবার উপরেই অভিমান করে, অণুভা চোখ নামিয়ে বললে, 'না, কী আবার হবে!'

'হ্যাঁ, কী আবার হবে, কিছুই হয়নি।' উজ্জ্বল মুখে হিমাদ্রি একটু হেসে এক পা এগিয়ে এল : 'সমস্ত আপনার মনের ভূতের ভয়।'

'আমিও তো আগাগোড়া সেই কথাই বলছি।' বনমালীবাবু উৎসাহিত হয়ে ঘরের ভিতর থেকে লোহার একটা চেয়ার নিয়ে এলেন।

চেয়ারটা আরো কাছে টেনে এনে হিমাদ্রি, যেন কতদিনের পরিচয়, অণুভার লতানো, শুকনো বাঁ-হাতটি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল, বললে, 'টেম্পারেচারের চার্টটা দেখি?'

'কিছুই যখন হয়নি,' অণুভা তাই বলে হাতটা টেনে নেবার মতো শক্তি সংগ্রহ করতে পারল না : 'তখন ও-সব ঝঞ্ঝাটে কী দরকার বলুন! দিন তো কোনো-রকমে কেটে যাচ্ছেই সবাইকার।'

'তা কাটবে বৈকি। তৎসত্ত্বেও,' হিমাদ্রি নির্ভয়ে হেসে উঠল : 'জ্বরের ওঠা-পড়ার ফর্দ একটা রাখা উচিত।'

'আপনি যে আসবেন, আমাকে দেখতে যে

কোনোদিন ডাক্তার আসবে, এ-কথা আমার জানা ছিল না।'

'কেনই বা আসবে?' বনমালীবাবু বিরক্তির প্রায় একটা ধমক দিয়ে উঠলেন: 'তোর কী হয়েছে যে সাত-তাড়াতাড়ি একটা ডাক্তার ধরে আনতে হবে? ডাক্তার নিয়ে আসাই মানে হচ্ছে ব্যারামটা শুধু বাড়িয়ে তোলা, রুগী তো আর ব্যাধিতে মরে না, মরে ডাক্তারিতে। তবে এ আমাদের হিমাদ্রি, শৈলেশের বন্ধু—'

আভা-ভরা বড়ো-বড়ো দুটি চক্ষুতে অণুভা হিমাদ্রির দিকে তাকাল।

'একরকম আত্মীয়ই বলতে পারি।' বনমালীবাবু সাহস অবলম্বন করে বললেন, 'তা-ও বা, এত বড়ো একটা ডাক্তার হয়ে এসেছে, সহজে বিরক্ত করতে পারি নাকি? তবে কিনা কাশতে গিয়ে দাঁত থেকে কি তোর রক্ত পড়েছে বলছিস, তাই ওর একশো কাজের মাঝে জোর করে ধরে নিয়ে আসা। তোদের তো আবার ডাক্তার না হলে অসুখ সারে না।

বুঝলে হিমাদ্রি, এত দিন মাস্টারের খরচ জুগিয়ে এসেছি, এখন ডাক্তারের খরচ জোগাও।'

কথাগুলি হিমাদ্রি গায়েও মাখল না, নিভৃতে কথা বলার মতো করে বললে, 'চলুন, ঘরে চলুন।'

'ঘরে ?' অণুভা এমন ভাবে কথাটা বলল, যেন পৃথিবীতে ঘর বলে তার কোনো জায়গা নেই।

'হ্যাঁ, আপনার লাঙসটা একবার দেখতে হবে।'

একটির পর একটি দাঁতে মসৃণ হেসে উঠে অণুভা বললে, 'অসুখ আমার দাঁতে, আপনি আমার লাঙস দেখবেন কী !'

বনমালীবাবু গর্জে উঠলেন: 'সবতাতে তোর অবাধ্যপনা, অণু! এ শুধু শৈলেশের বন্ধু হিমাদ্রি নয়, এ হিমাদ্রি রায়, যার শুধু নামোচ্চারণ করলেই রুগীরা ভালো হয়ে যায় শুনেছি, স্বয়ং সে আজ তোকে দেখতে এসেছে।'

ডান হাতটা আধখানা প্রসারিত করে দিয়ে হিমাদ্রি বললে, 'চলুন।' সেই প্রসারিত হাতে অণুভা যেন কী দেখলে। কী অসীম নির্ভর, কী বলীয়ান বন্ধুতা!

তার ভঙ্গুর, ম্রিয়মাণ দীর্ঘতায় অণুভা আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াল, এবং আশ্চর্য, হিমাদ্রির কোনো সাহায্য তাকে গ্রহণ করতে হল না। সকালবেলা ঘরের এই চৌকাঠটুকু পেরিয়ে আসবার বেলায় তার পা যেন উঠতে চাচ্ছিল না, এখন দস্তুরমতো গায়ে যেন সে হঠাৎ জোর পেল, এমন কি বিশৃঙ্খল শাড়িতে ক্ষিপ্র একটি সে লাবণ্য আনবার চেষ্টা পর্যন্ত করলে। আশ্চর্য, কী করে যে একটুও না টলে সোজা বিছানায় এসে সে শুতে পারল, কিছুই তার আর মনে পড়ছে না। শুধু ক্লান্ত মুখে কমনীয় একটি আভা আনবার জন্যে অস্ফুট যে একটুখানি হাসল তার করুণ কৃত্রিমতাতেই সে হিমাদ্রির কাছে নিঃশেষ ধরা পড়ে গেছে।

বীতজ্যোতি কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মতো স্তিমিত একটি আলস্য। তার স্বল্প, শীর্ণ হাসিটি জীবনের সমস্ত নিরর্থকতার প্রতি সঙ্কেত। শেষ পর্যন্ত এ জীবনের কোথাও কিছু যে মানে হয় না, তার শুয়ে থাকার উদাস, দরিদ্র ভঙ্গিতে যেন তারই গভীর উচ্চারণ

রয়েছে উহ্য হয়ে। কিন্তু দার্শনিকতাকে প্রশ্রয় দেবার সময় নেই। হিমাদ্রি এক পাশে, তক্তপোশের উপরেই বসে পড়ল।

স্টেথিস্কোপ নিয়ে আরো একটু সরে এসে বললে, 'কিছুমাত্র সঙ্কোচ করবেন না।'

'না, ডাক্তারের কাছে সঙ্কোচ কিসের !'

'আর এ আমাদের শৈলেশের বন্ধু,' বনমালীবাবু গম্ভীর মুখে বললেন, 'আপনার জন।'

সত্যি, কিছু বিশেষ আর দেখবার নেই। হাত দিয়ে ছোঁবার দরকার করে না, চোখেই দিব্যি জ্বরের চাপা ঝাঁজ পাওয়া যায় এমন অস্বস্থ, খসখসে চামড়া ; তারপর তার অন্তরালের যে চেহারা, নিমেষে হিমাদ্রির নিশ্বাস ভারি ও সমস্ত শরীর আড়ষ্ট হয়ে উঠল।

কিন্তু পরক্ষণেই হিমাদ্রি, যেন কোথাও কিছু হয়নি, আকস্মিক উৎসাহে ঝলমল করে উঠল, কিম্বা কোনো এক অভাবনীয় সে আবিষ্কার করে বসেছে। হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে কতকালের চেনা গলায়

জিগগেস করলে, 'আমার সঙ্গে একটুখানি আপনি এখন বেরুতে পারবেন?'

যেন এমন প্রশ্ন কেউ তাকে কোনোকালে করতে পারে না তেমনি অলৌকিক অবাক হয়ে অণুভা বললে, 'আমি, আমি যাব?'

'হ্যাঁ, কিছু আপনার কষ্ট হবে না। এটুকু সিঁড়ি সহজেই আপনি আমাদের হাত ধরে নেমে যেতে পারবেন, তারপরে রাস্তায় আমার মোটর দাঁড়িয়ে।'

'আমি কোথায় যাবো?' অণুভার বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটেনি, চার পাশে নির্বোধের মতো যেন একটা আশ্রয় খুঁজছে।

'হ্যাঁ, কিছু আপনার তৈরি হতে হবে না—ভয় কী,' হিমাদ্রি প্রসন্নতায় নির্ভীক মুখে বললে, 'আমার সঙ্গে যাবেন, ডাক্তারের সঙ্গে। খানিকক্ষণ বাদেই আবার আপনাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।'

'তৈরি না হয়ে যাওয়া তো আমি শুধু একটাই জানতুম,' অণুভার মুখে সন্দিগ্ধতার শাণিত সেই হাসিটি আবার ফুটে উঠল : 'আমি এতদিন তারই

প্রতীক্ষায় দিন গুনছি, আর সে-যাওয়ায় ফের বাড়ি ফিরে আসার কোনোই সর্ত নেই।'

'সেদিন কবে চলে গেছে। উঠুন ; আচ্ছা, দাঁড়ান,' হিমাদ্রি ব্যস্ততায় টগবগ করে উঠল: 'আপনার বাবার আগে মতটা নিয়ে আসি।' বলে স্তব্ধতায় পাষাণকায় বনমালীবাবুকে হাতের ইশারা করে ডেকে নিয়ে সে ঘরের বাইরে হঠাৎ অন্তর্ধান করলে। ফাঁকা একটা জায়গা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। পাশে আর দুটো মোটে ঘর, কিন্তু তাতে বনমালীবাবু তাঁর সমস্ত সংসার কায়ক্লেশে সঙ্কুচিত করে এনেছেন। অনেক অন্ধিসন্ধি পেরিয়ে ছোট, নির্জন একটা খুপরি পাওয়া গেল, বনমালীবাবুর এ-পক্ষের ছেলেদের পড়বার ঘর, ছেলেরা কখন ইস্কুলে চলে গেছে। পাওয়া গেল একটা বসবার মতো তক্তা, উইয়ের উৎপীড়নকে ছেঁড়া একখানা মাদুর দিয়ে কোনোরকমে ঢাকা হয়েছে। নিতান্তই আপনার জন, উপযুক্ত মর্যাদা হচ্ছে না বলে বনমালীবাবুকে বিন্দুতম কুণ্ঠিত হবার সে সুযোগ দিল না, হিমাদ্রি সেই তক্তপোশের

উপরেই বসে পড়ল। ভীত, পাংশুমুখে বনমালীবাবু জিগগেস করলেন : 'কেমন দেখলে ?'

হিমাদ্রি একটুও দ্বিধা করল না, গলায় তার এতটুকুও একটু আবেশ নেই,-বললে, 'যা দেখবার তাই, টি-বি।'

বনমালীবাবু বসে পড়লেন : 'তুমি—তুমিও এই কথা বল ?'

'উপায় কী বলুন,' হিমাদ্রি স্বচ্ছ স্নিগ্ধ একটুখানি হাসল।

'যাক।' বনমালীবাবুর হাত দুটো কাঁধের থেকে আলগা হয়ে ঝুলে পড়ল, লম্বা, শীর্ণ মুখে তিনি তক্তপোশের একধারে এসে বসলেন।

'যাবে কী! আপনি ঘাবড়াচ্ছেন কেন ? আমি,' হিমাদ্রি এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল : 'আমি তবে আছি কী করতে ? কোনো ভয় নেই,' শিশুর মতো সরল বিশ্বাসে সে বললে, 'ঠিক ভালো হয়ে যাবে।'

'ভুল, ভুল, সব ভুল,' বনমালীবাবু দুই হাতে মুখ লুকোলেন। পরে মুখ তুলে : 'আমি যে অনেক

আশা করেছিলুম, হিমাদ্রি, শেষকালে তোমার মুখে এই কথা ! তুমি এত বড়ো একটা ডাক্তার !'

'তাতে কী হয়েছে ?' হিমাদ্রি অনর্গল হেসে উঠল : 'আপনি তাতে অমনি হাত-পা ছেড়ে বসে পড়লেন কেন ? উঠুন, আমাদের সঙ্গে আপনাকেও যেতে হবে।'

'কোথায় ?'

'ওর লাঙস-এর একটা প্লেট নিতে হবে।'

'সে যে অনেক খরচ।'

'কত আর খরচ ! আপনি চলুন। সঙ্গে ওর স্পিউ-টামটাও নিয়ে যাব।'

'তুমি যে আমাকে একটা রাজকীয় বিলাসিতার মধ্যে নিয়ে এলে,' বনমালীবাবু বিস্বাদ, নিষ্প্রাণ গলায় বললেন, 'গরিবের এত সব বাবুয়ানা চলবে কি করে ?'

'উপায় কী বলুন। অসুখ যখন করেছে, আর বেশির ভাগ বলতে গেলে, গরিবের ঘরেই যখন ও-অসুখ,' হিমাদ্রি অপরাধীর মতো মুখ করে বললে, 'তখন

ব্যবস্থা তো একটা করতেই হবে আমাদের—আমরা, যারা এখনো কিনা সুস্থ দেহে বেঁচে আছি।'

'বেঁচে আর থাকতে দিল কই—ও-মেয়ে কি আমাকে কম জ্বালিছে ভাবো?' বনমালীবাবু তপ্ত হয়ে উঠলেন : 'গরিবের ঘর! গরিবের ঘরে আর মেয়ে হয় না? না, সবাই তারা বাপ-মায়ের সঙ্গে এমন একটা বিশ্বাসঘাতকতা করে?'

'কেউ-কেউ তো করে, তা নিয়ে তর্ক করে লাভ কী!' হিমাদ্রি নির্লিপ্ত যান্ত্রিক গলায় বললে, 'অসুখ করাটা সংসারে এমন কিছু একটা বিচিত্র ঘটনা নয়, বরং সশরীরে বেঁচে থাকাটাই এখানে নিতান্ত অস্বাভাবিক। অসুখ যখন করেছে, তখন তার প্রতিকার তো দেখতে হবে—অন্তত যা আমাদের কাজ।'

'অসুখ?' যেন তাতে অণুভা কী ভীষণ অপরাধ করে বসেছে এমনি করে বনমালীবাবু ঝাঁজিয়ে উঠলেন; 'কেন অসুখ করতে যাবে?'

'হয়তো যথেষ্ট পুষ্টি ছিল না, নিয়মিত ব্যায়াম, অপরিমিত আলো-বাতাস,' হিমাদ্রি যে কি বলে কী

বোঝাবে সেই মুহূর্তে স্পষ্ট কিছু অর্থ খুঁজে পেল না।

'কিন্তু পরিপুষ্ট হতে তাকে কে বারণ করেছিল জিগগেস করি?' বনমালীবাবুর মুখ ঘৃণায় কুটিল হয়ে উঠল: 'কে তাকে বলেছিল তুমি বই পড়তে-পড়তে বইয়ের মতোই শুকনো, শাদা হয়ে যাও?' হঠাৎ তাঁর গলা আত্মীয়তায় আর্দ্র হয়ে এল: 'তোমাকে বলব কি হিমাদ্রি, কতদিন থেকে কত ভালো-ভালো সম্বন্ধ এসে তার ফিরে গেছে, কত শাসন, কত সাধনা, তবু একটাতেও তোমার ঐ বিদুষী মেয়ের মন উঠল না? ইচ্ছে করলে কী না ও পেতে পারত, সম্মান বল, সমৃদ্ধি বল, সম্ভোগ আর সৌভাগ্য—মেয়েমানুষের সংসারে যা কামনীয়। পরিপুষ্টির কথা বলছ, দস্তুরমতো ও মোটা হয়ে যেতে পারত ইচ্ছে করলে। এই চাপা, অন্ধ গলির বাইরে চলে যেতে পারত ও ফাঁকা আকাশের তলায়, ঢালা মাঠের মাঝখানে, মধ্য-সমুদ্রের শান্তিতে। তার দিকে না তাকিয়ে ও নিয়ে বসল কিনা বই, ভাবতে পার,

বইয়ের পর বই, হাড়ের মতো শুকনো, মানুষের চিন্তার কতগুলো কঙ্কাল, পরের মুখের শোষা কত-গুলো ছিবড়ে—কিন্তু, বল, কী পেল ও তাতে, কী রাজ্য ও জয় করল ত্রিভুবনে ? ঐ মূর্খ একটা ডিপ্লোমা—তাকেই তুমি ওর জীবনের কৃতকার্যতা বল ?'

'কিন্তু পৃথিবীতে সমস্ত সাক্‌সেস-এরই এক চেহারা,' হিমাদ্রি নৈর্ব্যক্তিক ভাবে বললে, 'সমস্ত ব্যর্থতারও। তাদের একদিন নিশ্চয় অসুখ করবে এবং একদিন নিশ্চয়তরো তারা মরবে—তার জন্যে শোক করা বৃথা।'

'না, শোক আমিও করব না,' বনমালীবাবু যেন আঁকড়াবার একটা অবলম্বন খুঁজে পেলেন : 'ছেড়ে দাও, সব তবে একই জায়গায় এসে শেষ হোক।'

'কে বললে, তেমন তো কোনো কথা নেই।' হিমাদ্রি হাসিমুখে বললে।

'কিসের ?'

'এই এমনি অনায়াসে ছেড়ে দেয়ার।' হিমাদ্রি সহসা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল : 'আমরা কাউকে ছাড়ব না, আমরা আশা করব, সংগ্রাম করব, ঘুম ভেঙে

জেগে উঠেও আমরাই দেখব স্বপ্ন। নইলে আমাদেরই বা ব্যর্থতার মানে কী?'

'তবে তুমি কী করতে বল?'

'চিকিৎসা করতে বলি।' হিমাদ্রিকে প্রায় বোকার মতো শোনাল।

'চিকিৎসা?'

কথাটা বনমালীবাবু যেন নতুন শুনছেন এমনি একখানা নিটোল মুখ করলেন: 'ঢের চিকিৎসা হয়েছে। ও সব হচ্ছে, বুঝলে কিনা, ভুয়ো সান্ত্বনায় মনকে খানিক ভুলিয়ে রাখা।'

হিমাদ্রি নিষ্ঠুরের মতো বললে, 'তাই বলে ওকে অমনি মরতে দিতে বলেন?'

'কী আর করা যাবে বল। কেউ যদি শখ করে নেহাত মরতেই বসে, তবে তুমি-আমি তার কী করতে পারি? গলায় সটান দড়ি না দিলেই কি আর আত্মহত্যা করা হয় না?' বনমালীবাবু গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন: 'ছেড়ে দাও, সব যখন এক জায়গায় এসেই শেষ হচ্ছে।'

'অসম্ভব। একবার যখন আমি এসে পড়েছি, তখন কিছুতেই ছাড়তে পারব না।'

'কী করবে ?'

'আমি ওকে ভালো করব।'

'ভালো ?' বনমালীবাবু কান্নার মতো করুণ করে হাসলেন : 'এ অসুখে কেউ কোনোদিন ভালো হয় না।'

'আপনাকে কে বললে ?'

'কেউ বলেনি, আমি নিজে জানি। বই পড়ে নয়, ঠেকে শেখা, চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো।' বনমালীবাবু অভিভূতের মতো বললেন, 'নইলে আমার শৈলেশ—'

হিমাদ্রি ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে রইল। বললে, 'তাই বলে, একজন গেছে বলে, আরেকজনকেও আপনি যেতে দেবেন নাকি ? কিছুতেই নয়, আমি যখন এসে পড়েছি। আপনাকে চিকিৎসা করাতে হবে।'

'কোনো লাভ নেই। শুধু কামানই দাগবো, মশা মরবে না।'

'তবু শেষ পর্যন্ত আপনাকে চিকিৎসা করাতে হবে।' হিমাদ্রি দীপ্ত, দৃঢ় গলায় বললে, 'আমি শেষ পর্যন্ত দেখব।'

'সে যে বিস্তর খরচ—রাজসূয় ব্যাপার।'

'তা কে না জানে?' হিমাদ্রি প্রায় শাসনের সুরে বললে, 'অসুখ হলে তার চিকিৎসাতে খরচ হয়েই থাকে সবাইকার, সেটা আর কী এমন বেশি কথা বলছেন?'

'বেশি কথা বই কি, এই শাদা হাতি আমি পুষব কোত্থেকে?'

'তাই বলে,' সেই পুরোনো কথা: 'তাই বলে ওকে তো আপনি অচিকিৎসায় মরতে দিতে পারেন না।'

'আমি মরতে দিচ্ছি?' বনমালীবাবু রাগে শিখায়িত হয়ে উঠলেন: 'ও নিজে ইচ্ছে করে দিনের পর দিন তিল-তিল মরতে বসেনি? নইলে, তুমি আগে ওকে কোনোদিন দেখেছ কিনা জানি না, কী সুন্দর ওকে দেখতে ছিল! এই হাড়-বার-করা কদাকার চেহারা ওর কে করেছে—এমন [illegible]দাকার, হাত বাড়িয়ে

ছোঁয়া দূরের কথা, চোখ মেলে তাকাতে পর্যন্ত ঘেন্না করে! এ ওর নিজের রচনা, নিজের অপমান। কেন, কেন সে এতগুলি সোনার বৎসর অসার কতগুলি অক্ষরের আবর্জনা ঘাঁটলে, কী স্বর্গ খুঁজে পেতে? তার শরীরের চাইতে বইয়ের পাতার মধ্যে বেশি রস, বেশি লাবণ্য ছিল? কেন সে সময়মতো বিয়ে করল না? কত ভালো-ভালো সাধা সম্বন্ধ।'

'বলা যায় না, বিয়ে করলেও, বিয়ের পরেও ওর এ-অসুখ হতে পারতো।' হিমাদ্রি ব্যস্ততায় ছটফট করে উঠল: 'তার জন্যে অনুতাপ করার কোনো মানে হয় না।' ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করে: 'চলুন, আমার বিশেষ সময় নেই, আমাদের সঙ্গে আপনাকেও হাসপাতালে যেতে হবে।'

'দেখ,' গাম্ভীর্যে বনমালীবাবুর সমস্ত মুখ কালো হয়ে উঠেছে: 'ও-সব হ্যাঙ্গাম আমি পোয়াতে পারব না। খরচ না করলেও যা, খরচ করলেও যখন তা-ই, তখন আমি ওকে সোজা ঈশ্বরের নামেই ছেড়ে দেব।'

তাঁর মুখের দিকে হিমাদ্রি প্রায় বিমর্ষের মতো তাকিয়ে রইল।

'সোজা কথা, দেখতেই তো পাচ্ছ চারিদিক চেয়ে,' বনমালীবাবুর মুখে এতোটুকু একটা রেখা ফুটল না : 'আমার অত টাকা নেই, পারব না আমি রোগের জন্যে ভোগের নৈবেদ্য সাজাতে। তোমাকে ডেকে এনেছিলুম, তুমি একজন এ-সব ব্যারামে মস্ত স্পেশ্যালিস্ট—ভেবেছিলুম, মনে ভারি আশা ছিল হিমাদ্রি, এক কথায় তুমি আমার সকল সন্দেহ দূর করে দেবে। তোমার, তোমাদের মুখে বড়ো-বড়ো সব কথা, আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্য দিয়ে তার সঙ্গে আমি পাল্লা দিতে পারব কেন? এমনিতেই যখন যাবে, তখন রাজ্যের কতগুলি দামি বিলিতি ওষুধ না খাইয়ে দিশি-মতে টোটকাটাটকি করলেই বা ক্ষতি কী?'

'আমাকে যদি না ডাকতেন, যদি আমি না আসতুম, যা খুশি আপনারা করতেন, আমার কিছু বলার থাকত না। কিন্তু আমি যখন এসে পড়েছি তখন

আর কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া নয়, ওকে ভালো করতেই হবে আমাকে। আমরা, ডাক্তাররা, মানুষের তুচ্ছ সেন্টিমেন্ট, বাপ-মেয়ের মান-অভিমানের ধার ধারি না, আমরা বুঝি রোগ—সে-রোগ আমাদের ভালো করা চাই। অন্তত আমি একবার চেষ্টা করব, প্রাণপণ চেষ্টা করব।' হিমাদ্রি তার উদ্ভাসিত, উদার দৃষ্টিতে বনমালীবাবুর সমস্ত চিত্ত প্রায় প্লাবিত করে দিল : 'খরচ, খরচের জন্যে আপনি ভাববেন না, সে-সব আমি ঠিক ব্যবস্থা করে দেব। আপনি এবার চলুন।'

প্রায় তরল গলায় বনমালীবাবু বললেন, 'আমি কী করে যাব ? আমার যে আপিস।'

কোনোদিকে বিন্দুমাত্র তাকাবার সময় নেই হিমাদ্রি এমনি অস্থির হয়ে উঠল : 'তা হলে আমাকে একলাই নিয়ে যেতে হবে।'

'দেখ চেষ্টা করে, চেষ্টা যখন করবেই বলছ,' বনমালী-বাবু তাকে শিথিল, স্খলিত পায়ে অনুসরণ করলেন : 'কিন্তু সব মিলে, সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত আশা, সমস্ত স্বপ্ন

মিলে সেই শূন্য, আমাদের সবাইকার পক্ষে সমান, একমাত্র প্রমাণ। তবে চেষ্টা করে দেখতে যখন চাও—'

হিমাদ্রি ততক্ষণে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

জলের উপরে ম্লান শীতল একটুখানি জ্যোৎস্নার মতো অণুভা তার কাতর কৃশতায় প্রসারিত হয়ে শুয়ে আছে। হিমাদ্রি তার শিয়রের কাছে সরে এসে ডাকলে : 'চলুন।'

ঝরে পড়ার মুখে মরা, শুকনো পাতায় শীতের হাওয়ার মৃদুল শিরশিরানির মতো অণুভা চঞ্চল হয়ে উঠল। বললে, 'কোথায় ?'

'আমি যেখানে নিয়ে যাচ্ছি।' হিমাদ্রি সরল হাসিমুখে বললে।

বিস্ময়ে অণুভা যেন ছিঁড়ে পড়বে। অসহায়ের মতো শূন্য চোখে বনমালীবাবুর মুখের দিকে একবার তাকালো।

'আপনার বাবারই হুকুম, আমার সঙ্গে আপনাকে এখন একটু বেরুতে হবে।' যেন কোথাও কিছু হয়নি

এমনি নির্মলতায় হিমাদ্রি হেসে উঠল : 'আর, সে-ক্ষেত্রে আপনার কোনো ওজর-আপত্তিই আমি শুনব না। নিন, উঠুন, অতি সহজেই উঠে পড়তে পারবেন।'

'হ্যাঁ, ওঠ্, ভয় নেই,' বনমালীবাবু নিশ্চিন্ত গলায় বললেন, 'কতক্ষণ এই বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসা মাত্র।'

আশ্চর্য, বাবা তাকে বাইরে থেকে ঘুরে আসতে বলছেন, অণুভা বিস্ময়ে বিভোর হয়ে উঠে বসল। বললে, 'বাবা, তুমি?'

'উনি কী করে যাবেন? ওঁর যে আপিস।' হিমাদ্রি বললে।

'হ্যাঁ, আমার যাবার কী দরকার! সঙ্গে তোর ডাক্তার রইল, আর কেউ নয়, হিমাদ্রি, আমাদের শৈলেশের বন্ধু, কলেজে থাকতে এক-প্রাণ এক-আত্মা ছিল। শৈলেশের মুখে কত ওর কথা শুনেছি—তা, এত বড়ো ডাক্তার হয়েও আমাদের ও ভোলেনি, সোনার টুকরো ছেলে। তোর কিছুমাত্র ভয় বা

সঙ্কোচ করতে হবে না, অণু।' বনমালীবাবু তক্তপোশের দিকে এগিয়ে এলেন : 'সিঁড়ি দিয়ে নামতে পারবি তো ?'

'খুব পারবে।' হিমাদ্রির স্বর যেন প্রায় আকাশ-বাণীর মতো শোনাল।

ভাঙা-ভাঙা আঁকাবাঁকা কটি রেখায় অণুভা এলোমেলো আঁচলে মুগ্ধের মতো উঠে দাঁড়িয়েছে। অচঞ্চল, সরল গলায় বললে, 'এই পোশাকেই যাব ?'

'রুগীর আবার পোশাক!' বনমালীবাবু বললেন।

'আপনার যে রোগ, সেই তো আপনার পোশাক।' কথাটা বলে ফেলেই হিমাদ্রি নিজেকে সংশোধন করতে গেল : 'অন্তত ডাক্তারের চোখে।'

কথাটা অণুভাকে মোটেই লজ্জা দিল না ; এমন ভাবে বলা, বরং, যে-লজ্জা সে পেল তা তার কাছে ভারি নতুন, ভারি চমৎকার মনে হল।

না টলে সোজা সে এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। এবং কোনোদিন যে সে পায়ে-পায়ে সিঁড়ি ধরে নামতে পারবে, তাই তার জানা ছিল না।

অথচ কোথায় যে সে যাচ্ছে তার জানা নেই। কোথায় যে সে যাচ্ছে, এ যেন প্রায় মৃত্যুর মতোই রোমাঞ্চ, কোথায় যে সে যাচ্ছে।

বনমালীবাবু নিচে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। মোটরটা ছেড়ে দিল।

বন্ধ গলিটা পার হয়ে আসতেই দ্বারান্তবর্তিনী নগরী তার অজস্র মুখরতায় অণুভাকে অভিনন্দন করলে।

অণুভার সমস্ত শরীর ফুঁ-লাগা বাঁশির মতো সুরে স্পন্দমান হয়ে উঠল। এক বুক নিশ্বাস নিয়ে আপন খুশিতে নিজের মনে সে বললে, 'উঃ, কতদিন পরে আমি ফের কলকাতা দেখছি।'

হিমাদ্রি তার বলশালী সামীপ্যের স্তব্ধতায় দুর্ভেদ্য হয়ে রইল।

'যেন খারাপ-হওয়া চোখে নতুন চশমা পরেছি, চারদিক আমার বড়ো-বড়ো অক্ষরে অপরূপ ঝলমল করে উঠেছে।' ক্লান্তিতে গলে গিয়ে অণুভা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে : 'এ কেমন করে সম্ভব হল?'

হিমাদ্রি বললে, 'স্বপ্নকে সম্ভব যদি বা করেছি আমি, এবার সম্ভবকে আপনার সত্য করতে হবে।'

'সত্যি, আশ্চর্য, ভাবতেও পাচ্ছি না, আমি আবার বেরুলুম। গায়ে আমার আবার হাওয়া লাগল। এই হাওয়ায়,' অণুভা[illegible]তার দু-চোখের বিশাল পরিব্যাপ্ত হতাশায় হিমা[illegible] মুখের দিকে তাকাল : 'আমার মনে হচ্ছে ডাক্তারবাবু, আমার গা থেকে আইডিন-লাগা মরা চামড়ার মতো আমার এই জ্বর, বিষণ্ণ শুষ্কতা, এই ক্লান্তিকর আলস্য এক্ষুনি যেন খসে পড়ে যাবে। এ কি হয় না, হতে পারে না?'

'নিশ্চয়।' হিমাদ্রি দৃঢ়তায় উদ্দীপ্ত গলায় বললে।

'হলে কার কী ক্ষতি হত পৃথিবীতে?' এই অপরিমাণ হতাশায় অণুভাকে কী অনির্বচনীয় সুন্দর লাগছে, সেই নৈরাশ্যকে উজ্জ্বল করে দেখাবার জন্যেই মলিন সে একটুখানি হাসল : 'আচ্ছা, ধরুন, এই আমি চোখ বুজে শুয়ে আছি, কেউ এসে চুপি-চুপি আমাকে ছুঁলো, আমাকে জাগিয়ে দিল, আর আমি জেগে উঠেই দেখতে পেলুম আমার গায়ে

আর জ্বর নেই, নেই আর এই ম্রিয়মাণ শীর্ণতা, আমি ছন্দে আর ছটায় নতুন মানুষ হয়ে উঠেছি, যেমন চশমা-পরা চোখের কাছে এই নতুন কলকাতা !'

অণুভার ছু-চোখ মিনতিতে ঝাপসা হয়ে এলো : 'এ হয় না ? এ আপনি পড়েননি কোনোদিন বইয়ে ? শোনেননি কোথাও ?'

'শুনিনি, পড়িনি, স্বচক্ষে আমি দেখেছি।'

'দেখেছেন ? কোথায়, কবে ?'

'এখন, এইখানে।' হিমাদ্রি সতেজ, গম্ভীর গলায় বললে, 'আপনাকে।'

'আমাকে ?'

'হ্যাঁ, বিশ্বাস করুন, গা থেকে আপনার এই জ্বর নেমে যাচ্ছে, শরীরে আসছে ফের নতুন জোর, নতুন জোয়ার,' হিমাদ্রি তার স্বরে সমস্ত ব্যক্তিত্ব সঞ্চারিত করে বললে, 'জীবনে আপনি এ-মুহূর্ত থেকে নতুন পৃষ্ঠা বদলাতে শুরু করেছেন।'

'এ মুহূর্ত থেকে !' অণুভা অনড় ছুই চোখে হিমাদ্রির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'হ্যাঁ, এই মুহূর্ত থেকে।' হিমাদ্রি আত্মগতের মতো বললে, 'কেননা এই মুহূর্ত থেকে আমি আপনার জীবনে এসে পড়েছি। আমি আপনাকে ভালো করব।'

যেন কতকাল ঘুমুতে পারেনি এমনি নিবিড়, পরিতৃপ্ত আলস্যে অণুভা চোখ বুজল। কোনো কথা বলল না। কোনো কথা বলল না, কিন্তু অস্তিত্বের গভীর প্রসুপ্তির মধ্যে থেকে স্পষ্ট সে অনুভব করলে তার সমস্ত শরীর যেন হঠাৎ ছুরির ফলার মতো রক্তাক্ত ধারালো হয়ে উঠেছে, বাঁচবার স্পৃহায় তার সমস্ত স্নায়ু-শিরা যেন অসহ্য আর্তনাদে এখুনি ছিঁড়ে পড়বে। তীর ছোঁড়বার আগেকার মুহূর্তে ধনুকের যেমন তীক্ষ্ণতা, তেমনি এখন নির্লক্ষ্য আনন্দ। অণুভা ভয়ে-ভয়ে, কী রোমাঞ্চকর সে ভয়, পর্বতচূড়ার থেকে নিচের সমতলতার দিকে চেয়ে থাকবার মতো, একটু-বা অলস, গাঢ় চোখে হিমাদ্রির দিকে তাকাল। হ্যাঁ, বিশ্বাস সে করবে, এমন আবির্ভাবকে বিশ্বাস সে না করে পারে না, দেবতার মতো, সূর্যের মতো

আবির্ভাব। অন্ধকারের গুহা থেকে বেরিয়ে-আসা সিংহের মতো সূর্য। যে-সমুদ্র সে কখনো দেখেনি তারই যেন নীল সীমাহীনতা সে দেখতে পাচ্ছে। হ্যাঁ, সে ভালো হবে, ভালো না হয়ে সে বাঁচবে কি করে?

আর অণুভার মাঝে হিমাদ্রি দেখছিল শুধু এই বাঁচবার আকুলতা। দাবানলের জন্যে মুমূর্ষু দীপ-শিখার লেলিহান কাকুতি। রোগে শীর্ণ, অপরিচ্ছন্ন একটি মেয়ে, শুধু বাঁচবার ইচ্ছা দ্বারা সুন্দর, বাঁচবার ইচ্ছাতে সে পবিত্র। এত রূপ সে কখনো দেখেনি, অচরিতার্থতার এই ভয়াবহ সৌন্দর্য! হিমাদ্রি সমস্ত সত্তায় মধুর একটি চাঞ্চল্য অনুভব করলে।

বিরাটকায় একটা বাড়ির মধ্যে গাড়িটা ঢুকতেই অণুভা হঠাৎ তন্দ্রা ঠেলে চমকে উঠল: 'এ কী, আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'আপনি জানেন না, কোথায়?'

'না তো।'

'তবু আপনি চলে এলেন?'

'বা রে, কে যেন আমাকে বললে, কোথায় যেতে হবে, আমিও তাই বেরিয়ে পড়লুম।' অণুভা ক্লান্ত, ঘুমন্ত গলায় বললে, 'জেনেছি অনেক, আমার কাছে তা অনেক, তখন একবার কেন জানি ভারি না-জানতে ইচ্ছা হল। এটা কী?'

'হাসপাতাল।'

'হাসপাতাল?' অণুভা যেন মুহূর্তে নিজেকে ফিরে পেল, বিমর্ষ গলায় বললে, 'আমাকে এখানে রেখে যাবেন নাকি?'

'না।'

'কোনো কাজ আছে?'

'আছে।'

'কতক্ষণ দেরি হবে?'

'বেশিক্ষণ নয়। আসুন।' গাড়ির দরজা খুলে হিমাদ্রি আস্তে হাত বাড়িয়ে দিল।

'তারপর?'

'তারপর আবার কী! আমরা ফের ফিরে যাব।'

'ফিরে যাব?' ফিকে-হয়ে-আসা দিনের কিনারে

সন্ধ্যাতারার মতো অণুভা উজ্জ্বল হয়ে উঠল : কোথায় ?'

'এবার বুঝি জানতে ভারি ইচ্ছে হচ্ছে ?' হিমাদ্রি হাসিমুখে বললে, 'ভয় নেই, বাড়িতে।'

'বাড়িতে।' কথাটা অণুভা একবার ধীরে উচ্চারণ করলে।

'আসুন, আপনার এখানে একটা ফোটো নেব।'

'ফোটো নেবেন ? নিন, যা আপনার ইচ্ছে, যা আপনি ভালো বোঝেন—আপনার হাতে যখন এসে পড়েছি।' দরজার কাছে সরে এসে অণুভা তার শীতল, শীর্ণ, শান্ত হাতখানি হিমাদ্রির হাতের মধ্যে তুলে দিল।
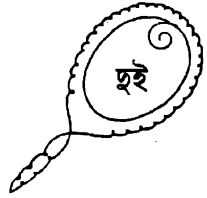
সেই দিন থেকে হিমাদ্রি তার মানুষের জীবনে অতিকায় একটা দৈত্যের প্রেরণা নিয়ে এসেছে। খুঁজে পেয়েছে সে নতুন কাজ, জীবনের নতুন কেন্দ্র করেছে সে আবিষ্কার, তার পরিধি এসেছে সঙ্কীর্ণ হয়ে। এই তার লক্ষ্য, অণুভাকে ভালো করতে হবে, ভালো করতে হবে মানে তার রোগের যে বীজাণু, তাকে তার হত্যা করতে হবে। অণুভার চেয়ে অণুভার এই রোগের প্রতিই তার বেশি আকর্ষণ। শামুকের জীবনে সূর্য বলে যেমন কোনো অস্তিত্ব নেই, আলো ও তাপের কতগুলি তারতম্য, তেমনি হিমাদ্রির দৃষ্টিতে অণুভা একটা ব্যক্তি ছিল না,

গবেষণার একটা বিষয়। জীবনের দুরূহতার চেয়ে রোগের এই জটিলতা কিছু কম নয়। আগে তার মেরুদণ্ড সিধে হোক, পরে তার দণ্ডায়মানতার মহিমা দেখা যাবে।

দুদিনে সমস্ত বন্দোবস্তই ঠিক-ঠাক, কাঁটায়-কাঁটায় রুটিন তৈরি। যতদূর সম্ভব ঘরের জানলাগুলোকে সে প্রসারিত করে দিয়েছে, রাতের অন্ধকারেও তাদের অবগুণ্ঠিত করা হয়নি। যে সমস্ত নির্লজ্জ আসবাব ছিল এখানে-সেখানে ভিড় করে, সমূলে বিতাড়িত করা হয়েছে, পাওয়া গেছে অনেকটা শূন্য, অনেকটা বিরলতা। আবরণের শাসন আনতে হয়েছে শিথিল করে, গায়ে এবার হাওয়া লাগুক, কেননা মানুষের পোশাকের নিচেই আসল হাওয়া-বদল। কি-কি খেতে হবে, কত হাজার ক্যালরি, কি করে বাড়বে শরীরের মেটাবলিজম। চৌকাঠের এ-পারে বাড়ির কারু অনাবশ্যক উঁকি মারবার অধিকার নেই, দিতে হবে বিস্তীর্ণ বিশ্রাম, অবারিত বিরতি। সাপ্তাহিক ভাড়ায় দিশি নার্স পর্যন্ত যোগাড় হয়েছে,

খাড়া হয়ে আছে সে কড়া পাহারায়, পানের থেকে এক কণা চুন সে খসতে দেবে না। কখন স্পঞ্জ, কখন ওষুধ, কখন ঘুম—সব একেবারে মুখস্ত, অণুভার এতটুকু এদিক-ওদিক নড়বার যো নেই। যন্ত্রের কাছে বৈজ্ঞানিক একটা নিয়মের মতো সে অসহায়। সময়ের হাতে নিজেকে সে নিঃশেষে ছেড়ে দিয়েছে।

তবু, রোজ ছুপুরে হিমাদ্রির একবার নির্ভুল আসা চাই: তার রুগী, তার উদ্ভাবন। এ-সময়টা প্রায়ই বনমালীবাবুর সঙ্গে তার দেখা হয় না ; দেখা হবার কি-ই বা দরকার, বনমালীবাবু নিশ্চিন্ত নিয়মিততায়, এগারোটার আগেই, তাঁর আপিস করতে পারছেন, কাঁধ ছুটো কিঞ্চিৎ হালকা হয়ে যাওয়াতে পায়ে তাঁর রীতিমতো ক্ষিপ্রতা এসেছে। এখন হিমাদ্রিই অণুভার বড়ো অভিভাবক, রুগীর পক্ষে ডাক্তারের চেয়ে আর বড়ো অভিভাবক কে হতে পারে? ডাক্তারের কথায়ই তার ওঠ-বোস, তার টানা-পোড়েন, এখানে অন্তত উদ্ধত উগ্রতায় তাঁর নাক ঢোকাবার কোনো মানে হয় না। তাই যে-সময়টায়

হিমাদ্রি আসে, নিঝুম, নিশুতি দুপুরবেলা, ছেলেরা চলে গেছে ইস্কুলে, পাশের ঘরে তার নতুন-মা প্রসারিত একটা মাসিক-পত্রের উপরে মুখ থুবড়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন, ডাক্তারের জিম্মায় ঘণ্টাখানেক তাকে রেখে নার্স বাড়ি থেকে খেয়ে আসতে যাবার উদ্যোগ করছে। উত্তরের বারান্দায় শুকোতে দেওয়া হয়েছে কাপড়, নিচে রাস্তা দিয়ে কাঁসা বাজিয়ে ফিরি করে চলেছে বাসনওলা, ঘুমো গলায় পায়রা ডাকছে কোন দেয়ালের ফোকরে। সমস্ত আকাশ যেন তার হৃদয়ের মতো স্তব্ধ। এমন সময় সিঁড়িতে যেন কার পায়ের শব্দ বেজে ওঠে। অণুভার শরীরে এতটুকু আর আশা ছিল না, শ্লেট থেকে পেন্সিলের দাগের মতো মুছে-যাওয়া সেই শরীর : হঠাৎ সেই শব্দে রক্তে জাগে ধার, ছাইয়ের তলা থেকে কণা-কণা আগুনের উষ্ণতা। সিঁড়ি থেকে ঘরের চৌকাঠটুকু পর্যন্ত অণুভার সময় যেন আর ফুরোয় না, বিছানার চাদরের প্রান্তটা সে তার মুঠোর মধ্যে জোর করে আঁকড়ে ধরে।

সমস্ত আয়োজন এখন সম্পূর্ণ, এবার মৃত্যু, তুমি আসতে পারো।

উদ্যোগপর্বের এই অভিনব বিস্তৃতি দেখে অণুভার গোড়ায় ভীষণ তাক লেগে গিয়েছিল, সশরীরে এতটা কখনো সে আশা করতে পারত না। অবধারিত মৃত্যু তার ভঙ্গিতে প্রখর সাহস এনে দিয়েছিল, তাই সে বনমালীবাবুকে একদিন জিগগেস করলে : 'বাবা, এত সব সম্ভব হল কি করে ?'

'কি করে আবার ! তোমার অসুখে।'

'আমার তো অসুখ আজ এই নতুন নয়।'

'তা কী করা যাবে বল।' বনমালীবাবু ঈষৎ ঘোলাটে গলায় বললেন, 'বিলিতি ডিগ্রিওলা নতুন ডাক্তার, তার নতুন রকম সব ব্যবস্থা। আমি যদি কিছু বলতে যাই, কানেও তুলবে না। নিজের খেয়ালে চলেছে।'

'তবে,' সমস্ত শরীরে সচকিত হয়ে অণুভা বললে, 'তবে এ-সবের খরচ যোগাচ্ছেন তিনি ?'

'কথা না শুনলে আমি কী করতে পারি ?

'কী করতে পার ! বারণ করে দিতে পার না ?'

'তার কী মানে, কেনই বা বারণ করতে যাব ? শৈলেশ থাকলে, করত না সে তার বোনের জন্যে ?'

'এ তোমার কী অদ্ভুত কথা, বাবা !' অণুভা ছাইয়ের মতো বিবর্ণ গলায় বললে, 'তাই বলে ডাক্তার এসে রুগীর জন্যে দু-হাতে খয়রাৎ করবে ? কোন স্পর্ধায় জানতে পাই ?'

'তোকে বাঁচাবার স্পর্ধায়।' বনমালীবাবু আবেগে দীপ্ত হয়ে উঠলেন : 'তোকে বাঁচানোই এখন তার কাজ, তার জন্যে কোনো বাধা, কোনো বারণ, কোনো বিবেচনার সে ধার ধারছে না।'

অণুভা একবার কেঁপে উঠল, শান্ত গলায় বললে, 'কিন্তু কেউ তো তাকে বাঁচাতে বলেনি।'

'বলবার সে কোনো অপেক্ষা রাখে না।' বনমালী-বাবু উদারতায় প্রসারিত হলেন : 'ডাক্তারদের কাজই তো এই, পরের, পৃথিবীর দুঃখ দূর করা; কত বড়ো দায়িত্ব তারা হাতে নিয়েছে।'

অণুভার চোখে হঠাৎ জল এসে গেল, আচ্ছন্নের মতো বললে, 'কিন্তু পৃথিবীতে আমার দুঃখটাই তো একমাত্র বড়ো ছিল না। তাকে অন্যত্র যেতে বলে দিয়ো, বাবা, আমার কোনো অসুখ করেনি।'

'কেনই বা যেতে বলে দেব?' বনমালীবাবু বিরক্তিতে তেতে উঠলেন: 'আমার কী, নিজে সেধে সে এই আগুনের টুকরো হাতে নিয়েছে, এই আগুন থেকে নাকি সে নতুন আকাশ তৈরি করবে। আমি কে, আমি কী করতে পারি, এ তার নিজের কাজ, নিজের নির্বাচন, নইলে, কী হত সেখানে, যদি সে কোনো স্পেসিফিক্ বার করবার জন্যে তার ল্যাবরো-টরিতে টিউবারকিউলসিস নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করত? সেখানে ঢালত না সে টাকা, দিত না সে অকৃপণ শ্রম, এমন ঐকান্তিক শুশ্রূষা? আমার কথা সে শুনবে কেন,' বনমালীবাবু গলা নামিয়ে আনলেন: 'সে তার মনের মতো একটা বিষয় পেয়ে গেছে মাত্র।'

'আমি তবে তার কাছে শুধু একটা বিষয়?'

'একটা আবিষ্কার, সে বলছিল। তাকে থামতে বলা বৃথা, সে তোকে ভালো করবে।'

তাই সেদিন, নির্বাপিত সে-দুপুরবেলায়, শিয়রের কাছে চেয়ার টেনে বসতেই অণুভা বাঁকা গলায় বললে, 'আপনি যে রোজ-রোজ আসেন, আপনার ফি পান?'

'ফি?' হিমাদ্রিকে যেন কে পিছন থেকে আঘাত করলে: 'ফি দিয়ে আমার কী হবে?'

'কী হবে মানে? ডাক্তারি আপনার জীবিকা নয়?'

হিমাদ্রি একটু হাসতে পর্যন্ত পারল না: 'তা কে না জানে?'

'আপনি নিজেই কেবল জানেন না। নইলে,' অণুভার চোখের ধারগুলি চকচক করে উঠল: 'অনর্থক এই ভূতের বেগার কোন ভদ্রলোকটা খাটে জিগগেস করি?'

'কিন্তু ফি আমি পাই না আপনাকে কে বললে?'

'পান?' কনুইয়ের উপর ভর রেখে অণুভা একটু উঠে বসবার চেষ্টা করল: 'এ-বাড়িতে এ পর্যন্ত কত টাকা আপনি পেয়েছেন শুনি?'

'টাকা, টাকাই আমাদের সমস্ত পাওয়া নাকি ?

'তবে কেন, কিসের জন্যে আপনি এই দিনের পর দিন মুমূর্ষু আমাকে নিয়ে এই অমানুষিক চেষ্টা করছেন ?'

'আরো অনেক কিছু তো আমরা পেতে পারি।'

'কি ?' অণুভা চঞ্চল হয়ে উঠল : 'বলুন।'

'সরল বাংলায় আপনাকে কি করে বোঝাব ? সুখ, তৃপ্তি, আমি কথাটা ঠিক পাচ্ছি না, আনন্দ, অহঙ্কার।'

'অহঙ্কার ?'

'হ্যাঁ, প্রবল অহঙ্কার।' হিমাদ্রি দৃঢ় মেরুদণ্ডে উদ্ধত হয়ে উঠল : 'আপনাকে আমি ভালো করব। সেই আমার রচনা, সেই আমার পুরস্কার।'

অণুভা ম্লান একটু হাসল ; বললে, 'কিন্তু এত লোক থাকতে আমার উপর আপনার এই পক্ষপাত কেন ? পৃথিবীতে আরো কত রুগী আছে, কত দরিদ্র, কত দুঃখী।'

'কেন, এ একটা অত্যন্ত শিশুর প্রশ্ন। সমস্ত জীবনের জানা দিয়েও আপনি একে কুলিয়ে উঠতে

পারবেন না। নইলে, আপনিই বলুন,' হিমাদ্রি চেয়ারটা আরো কাছে টেনে আনল: 'পৃথিবীতে এত লোক থাকতে আপনারই বা কেন এ অন্যায় অসুখ করবে?'

'তার নিশ্চয়ই কোথাও একটা উত্তর ছিল। কিন্তু আপনার এই অহেতুক মহানুভবতার কোনো মানে হয় না।'

হঠাৎ চেয়ার থেকে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে হিমাদ্রি বললে, 'তা হলে আমাকে আপনি চলে যেতে বলছেন?'

'অন্তত আমি হলে তো চলে যেতুম।' অণুভা যেন কষ্টে একটুখানি হাসল: 'নইলে, সমানে দিনের পর দিন আসছি, একটাও ফি পাচ্ছি না, আপনার মতো ভদ্রলোক সেজে বসে থাকতুম নাকি চেয়ারে? চলে তো যেতুমই, সোজা আদালতে গিয়ে মামলা ঠুকে দিতুম। নইলে, কে-না-কে একটা লোক মরছে, আমার ব্যবসা, আমার সময়, আমার কেরিয়ারের দাম তার চেয়ে অনেক বেশি।'

'কিন্তু আমি চলে যেতুম না।' হিমাদ্রি আবার বাধ্য ছেলের মতো চেয়ারে বসে পড়ল: 'অন্তত এখন তো কিছুতেই যাওয়া সম্ভব নয়।'

'সম্ভব নয়!' অণুভা যেন কি-রকম করে বললে।

'কক্‌খনো নয়।' হিমাদ্রি তাকে দৃষ্টির গাঢ়তায় আচ্ছন্ন করে ধরল: 'দস্তুরমতো আপনি এখন প্রায় কবরের তলা থেকে উঠে আসছেন, আপনার শরীরে স্বাস্থ্যের আভা ফুটছে—আয়নায় একবার তাকিয়ে দেখেছেন কি নিজের দিকে—রীতিমতো আপনি এখন সারবার পথে। আর এ-সময়ই আমি চলে যাব?' হিমাদ্রি উচ্ছ্বসিত হেসে উঠল: 'মজা মন্দ নয়। এত পরিশ্রম করে গায়ে আপনার একটু জোর এনে দিলুম কিনা, তাই তাড়িয়ে দেবার তেজ দেখাচ্ছেন। কিন্তু তাই বলে আমি যাব কেন? এতখানি এগিয়ে এসে আমি কিনা এখন সরে দাঁড়াব! চলে যে যাব,' হিমাদ্রির হাসি আরো এক পরদা উপরে উঠে গেল: 'এতদিনকার আমার সব পাওনা-পত্র চুকিয়ে দিতে পারবেন?'

'মৃত্যু ছাড়া কী আর আমার দেবার আছে বলুন।' অণুভা তার কমনীয় বিশীর্ণতায় কোমল একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললে : 'সে কথা নয়, কে-না-কে সংসারে এই একটা নগণ্যার জন্যে আপনি কেন এমন ক্ষতিগ্রস্ত হবেন ?'

'সংসারে কোনটা ক্ষতি আর কোনটা লাভ তা আর আপনার যাচাই করতে হবে না। আপনি রুগী, রুগীর মতো ব্যবহার করতে শিখুন।' হিমাদ্রি দর্পিত ভঙ্গি করে চেয়ারটা আরো কাছে টেনে আনল : 'আমি চিকিৎসক, আমার অধীনে যখন আপনি আছেন, আমার সমস্ত নির্দেশ আপনাকে পালন করতে হবে। আমি আপনাকে ভালো করবার ভার নিয়েছি, হৃদয়হীন মৌখিক তুটো ব্যবস্থা দিয়েই সে-ভার নামানো যাবে না। আর ভালো করবার ভার যখন নিয়েছি,' হিমাদ্রির চোখ-মুখ দীপ্তিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল : 'যে করেই হোক, ভালো আপনাকে করতেই হবে। তার জন্যে, কোনটা ক্ষতি কোনটা লাভ তা নিয়ে হিসাব করবার আমার সময় নেই।'

অণুভা অস্ফুট গলায় বললে, 'কিন্তু দেখছি আপনাকে আগে চিকিৎসা করা দরকার।'

'যখন দরকার হবে, করানো যাবে এবং কে জানে, তখন কপালে হয়তো এমন চিকিৎসকই জুটবে, জবরদস্তিতে যে আমারো চেয়ে দুর্ধর্ষ।' হিমাদ্রি অণুভার দিকে নির্ভীক হাত বাড়িয়ে দিল : 'দিন, আজ একটা ইনজেকশান করব।'

অণুভা পাশ ফিরে সামীপ্যে আরো একটু সঙ্কুচিত হয়ে এসে তার কুণ্ঠিত, করুণ করতল সেই প্রসারিত হাতের উত্তাপে ঢেলে দিল।

আর খানিকক্ষণ হিমাদ্রির ইনজেকশান করবার কথা মনে রইল না।
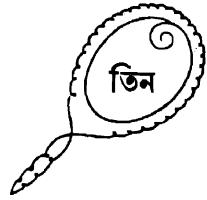
কতদিন যেতেই, বলার দরকার ছিল না, অণুভার অসুখটা আগুনের আকারে আবার লেলিহান হয়ে উঠল। যেটুকু রঙ দেখা গিয়েছিল তা গেল মুছে, যেটুকু শ্রী, তা এখন বাতি নিবে যাবার আগের বর্ণায়মান আর্তনাদ !

তবু অণুভা নিশ্চিন্ত, তার অসুখটা বেড়েছে, আরো কিছুকাল সে বাঁচতে পারবে। মরবার আগেই কিনা তার এই বাঁচবার আহ্বান এসেছে জীবনে, সমুদ্রে ডুবে যাবার মুহূর্তে সমুদ্রের নিঃসীমতা। মৃত্যু তার জীবনে আজ এ কী মূর্তিতে এল, এত গৌরবেও কিনা ব্যর্থ, এত সার্থকতায়ও কিনা অর্থহীন। দিন

থাকতেই চাঁদের নিরাভ একটি আভাস এসেছিল তার আকাশে, সে-চাঁদ বিহ্বল হয়ে না উঠতেই নেমে এল কিনা অন্ধকার। হায়, দিনের আলোর মতোই অন্ধকার। জীবন যতোই জীর্ণ বা বিক্ষত থাক না কেন, মৃত্যুতেই জীবনের চরম সাফল্য, চরম পূর্ণতা। কোনো অভিযোগ করবার নেই, অভিমান করবার নেই, এমনি একটা প্রশ্নহীন অনুত্তর। অণুভাও তেমনি একটা বিলুপ্তিতে নিজের পরিণতি খুঁজছিল। কিন্তু হঠাৎ জীবনের এ-পার থেকে কঠিন একটা প্রশ্ন বেজে উঠছে, আর মৃত্যুর গভীর নিরুচ্চারতায়ও সে সমাপ্ত থাকতে পারছে না।

না হোক, তবু সে মরবে, তার বাঁচা মানে হচ্ছেই ফুরিয়ে যাওয়া, বাঁচলেই তার আর কোনো আকর্ষণ নেই। বাঁচলে, তখন তার দেহে লাবণ্য আলুলিত হয়ে উঠেছে যৌবনের বিভোর ভারাক্রান্ততায়, তার চুলে এসেছে ঢেউ, চোখে এসেছে ধার, ঠোঁটে এসেছে বঙ্কিমা, বাঁচলেই তো সে খণ্ডিত, ক্ষুধিত—তার আর তখন তবে এই সম্মোহন কই, দিনে-

দিনে এই ক্ষীণায়মানতার সম্মোহন। তখন তো সে সাধারণ পাঁচজনের মতো, যাদের নিয়ে নির্বাচন চলে, যাদের মাঝে কাউকে হয় পেতে কাউকে হয় হারাতে, জীবন ভরে সেই আবার সফল হবার নিষ্ফল প্রতিযোগিতা। তার চেয়ে এ অনেক ভালো, এই একটি অখণ্ড মূল্য, অখণ্ড প্রাপ্তি। যেখানে তার মাঝে কোনো বিচ্যুতি নেই, পরিবর্তন নেই, মিথ্যাবাদিতা নেই—এই একটু-একটু করে নির্ভুল ক্ষয় হয়ে যাওয়া, একটিমাত্র মুহূর্তের অমেয় কালের মধ্যে অমূর্ত হয়ে থাকা। এই তো শান্তি, এই তো ভালোবাসা—নিজেকে এই নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ায়। নইলে, বাঁচলে তার রূপ থাকবে ঐশ্বর্য থাকবে না, ক্ষুধা থাকবে তৃপ্তি থাকবে না, বাস্তবতা থাকবে সম্ভাব্যতা থাকবে না; সেদিনও সে মরবে, কিন্তু থাকবে না এই তার অনন্ত চিরন্তনতা।

তবু, মৃত্যু কি আসে!

সেদিন বিনীতা এসেছিল, তার কলেজের সহপাঠী। বললে :

'তুই যে এখনো কেন ভালো হচ্ছিস না ভেবে অবাক হয়ে যাই।'

অণুভা ততোধিক অবাক হয়ে বললে, 'ভালো হওয়া কি আমার নিজের হাতে ?'

'কিন্তু ভাগ্যক্রমে যার হাতে এসে পড়েছিস', বিনীতা চপল চটুল চোখে বললে, 'তার হাতে তো সোনার কাঠি আছে শুনেছি, জলজ্যান্ত জাদুকর নাকি সে। তবু তোর ভালো না হবার মানে কোথায় ? আমি হলে তো কোন দিন ভালো হয়ে উঠতুম।'

অণুভা শীর্ণ, কাতর গলায় বললে, 'আমি নিতান্ত মুর্খ, নিতান্ত হতভাগ্য। তার এত সেবা, এত শ্রম, এত চেষ্টা কিছুই সফল হতে দিলুম না।'

'কে জানে তুই হয়তো আমারো চেয়ে চালাক, অণু।' বিনীতা অনর্গল হেসে উঠল : 'সেরে উঠলেই তো সব সারা হয়ে গেল। পৃথিবীতে এমন তো কোনো আর ব্যবস্থা নেই যে সুস্থ অবস্থায় ডাক্তার ডাকিয়ে লোকে শখ করে ফের অসুস্থ হবে !'

'কিন্তু তুই ভুল করছিস বিনু, এই ডাক্তারকে

কারুরই কোনোদিন ডেকে পাঠাতে হয় না, সে নিজের থেকেই আসে, আর শেষ পর্যন্ত ভালো করে তবে বিদায় নেয়।'

কথাটা অণুভা আশ্চর্য ঘুরিয়ে দিল।

বিনীতাকেও তাই অনাবশ্যক জোর দিয়ে অন্য গলায় বলতে হল : 'হ্যাঁ, ভালো তোকে সে নিশ্চয়ই করবে, সেদিন আলাপ করে যা বুঝলুম, কী দুঃসাধ্য চেষ্টা, কী দুর্দাম শক্তি। এততেও তুই যদি ভালো না হোস, ভালো হতে না চাস, অণু, তবে তার চেয়ে বড়ো রোগ তোর আর কিছু থাকতে পারে না।'

সত্যি, এত বড়ো একটা ইচ্ছাকে সে ব্যর্থ করে রেখে যাবে! এত আশা, এত বিশ্বাস, এত আপ্রাণ প্রার্থনা—কিছুরই সে সম্মান রাখতে পারল না? দিব্যি নিশ্চিন্ত আলস্যে সে মরতে বসেছে! মৃত্যু তার পক্ষে জয় কিনা কে বলবে, কিন্তু হিমাদ্রি গেছে হেরে, হিমাদ্রি গেছে হারিয়ে। তার দুই চোখ তখন শূন্য, দুই হাত তার রিক্ত, তার সমস্ত মুখ তখন নির্বাপিত—সেই বা অণুভার কেমনতরো পরিপূর্ণতা।

সত্যি করে বলতে, অণুভার পায়ের নখ পর্যন্ত শিরশিরিয়ে কেঁপে উঠল, বেঁচে উঠলেই বা কী এমন মন্দ হত, কী এমন ক্ষতি হত সংসারের !

কিন্তু, বেঁচে সে উঠলও ধরো কোনোরকমে, তখন, সত্যি করে বলো, কী বা তার মূল্য, কোথায় বা তার মাধুরী !

বিনীতার দিকে চাইতে সত্যি তার ভীষণ ভয় করে—এত রূপ, এত স্বাস্থ্য, জীবন্ত দেহে সে যেন বিশ্বাস করতে পারে না। শুধু কি রূপ, সে-রূপকে বহন করবার দুরন্ত স্পর্ধা : শুধু কি স্বাস্থ্য, তার যে আশ্চর্য শরীর আছে প্রতি পা-ফেলায় সেই আগ্নেয় উচ্চারণ। বাঁচা, মাত্র কায়িক বাঁচাটাই যে এত বড়ো একটা বিলাস এ-কথা বিনীতাকে না দেখলে ভাবা কঠিন। অকারণ খুশিতে সে হাসছে, নদীর অকারণ উর্মিমালার মতো, দীপ্তি পাচ্ছে সে তার সমস্ত উপস্থিতিতে, আকাশ অন্ধকার হয়ে গেলেও যেমন তার আলো। তার কাছে অণুভা একটা কী !

আজ সমস্ত দিন অণুভা তার পুরোনো এলবামটা

ঘাটছিল। এই তার চার বছর আগেকার ফোটো, যেবার সে ম্যাট্রিক দেয়। স্বাস্থ্যে শ্যামল, মসৃণ একটি মেয়ে, বাঁচাটা যে পৃথিবীতে এমন একটা দুঃসাধ্য ব্যায়াম, যার সেদিন বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না, বাঁচাটা যে এমন একটা নিদারুণ, নিশ্চিত আনন্দ। সেদিন সে হয়তো কখনো এমন সজ্ঞানে হাসেনি এমন বিগলিত অনর্গলতায়, সাজেওনি কোনোদিন এমন সশরীর শিহরণে, নিজেকে বিকীর্ণ করবার উদ্বৃত্তিতে। তারপর সে বই নিয়ে বসেছিল। কিন্তু কে তাকে তখন বলে দেবে বলো, যে, বইয়ের পৃষ্ঠার চেয়ে তার শরীরে ছিল বেশি রস, বেশি রহস্য; যা নেই তা করার চেয়ে যা আছে তা হওয়ায় ছিল বেশি অহঙ্কার। পরের ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে নিজের অর্থ সে ভুলতে দিয়েছিল নিজেকে। কিন্তু তা নিয়ে আজ আর শোক করে কী লাভ হবে, যা পায়নি তা নিয়ে নির্লজ্জ আকুতি। এখনো, এখনো, সে পেতে পারে, তার হাতে আছে আগ্রহ, রক্তে আছে স্বাদ, শরীরে আছে সমর্পণ। সে তার

মৃত্যু, লজ্জিত, পরাভূত মৃত্যু—সে তার বিপুল ব্যর্থতা, অর্থহীন অকারণ ব্যর্থতা—যা তার নিজের রচনা, নিজের মাহাত্ম্য।

এমন সময় কাঠের সিঁড়িটা কার পায়ের ভারে অণুভার বুকের মতো দুলে-দুলে উঠল।

সব ভুলে গিয়ে এখন একবার তার ইচ্ছে হল বেঁচে উঠতে। নিষ্কলুষ, নির্বিঘ্ন এক মুহূর্ত বাঁচা। কী পাবে বা হারাবে তা সমস্ত ভুলে গিয়ে নিশ্বাসহীন স্তব্ধতায় একবার বাঁচা, শরীরের বিস্তৃত অনুভূতিতে। যেমন করে গাছ বাঁচে, মাটির গভীর অন্ধকারে তার শিকড়, শব্দহীন আকাশের দিকে তার শাখা; বলিষ্ঠ, আত্মস্থ সেই নির্লিপ্ততা। বাঁচতে হবে বলে শুধু বাঁচা, স্তব্ধ, ঊর্ধ্বায়িত।

অণুভা চোখ বুজল। কোনো সুস্থ, সক্ষম লোক তার এই রুদ্ধশ্বাস, রুগ্ন ঘরে এসে ঢুকছে এ-দৃশ্য সে চোখ মেলে দেখতে পারবে না।

এত কুৎসিত, এত অশুচি নিজেকে অণুভার কোনোদিন মনে হয়নি।

কিন্তু আশ্চর্য, তাকেই কিনা কে আজ অযাচিত ক্ষমায় এসে অকুণ্ঠ স্পর্শ করল। অণুভা তা-ও বিশ্বাস করবে না বলে চোখ মেলল না। বললে, 'কে?'

'আমি। ভেবেছিলুম, ঘুমিয়ে পড়েছেন।' কপালের থেকে আস্তে হাত সরিয়ে নিয়ে হিমাদ্রি জিগগেস করলে: 'কেমন আছেন এখন?'

'ভালো নয়।'

'ভালো নয়, কে বললে আপনাকে?'

'আমি নিজেই বুঝতে পারছি।'

'ছাই বুঝতে পাচ্ছেন, ও-সব আপনার মন-গড়া বানানো কথা।' হিমাদ্রির আঙুলগুলি কপালের সীমানা পেরিয়ে অণুভার রুক্ষ কোঁকড়ানো চুলের মধ্যে এসে পড়ল: 'এ-পর্যন্ত কতই তো বুঝলেন নিজে। উঠুন, চোখ মেলুন, তাকান আমার চোখের দিকে।'

নিষ্পলক, মুগ্ধ ভয়ে অণুভা আস্তে চোখ মেলল।

হিমাদ্রি উঠল উদ্দীপ্ত হয়ে: 'বলুন, বলুন আপনি ভালো নেই?'

সে যে ভালো নেই, সেই মুহূর্তে অণুভা হঠাৎ যেন তা ভুলে গেল। ঠিক কোথায় যে তার অসুখ, হাত দিয়ে স্পষ্ট যেন তা সে ছুঁতে পারল না।

অণুভা তন্ময়ের মতো বললে, 'সত্যি, আপনি বলছেন, আমি ভালো আছি ?'

'নিশ্চয়ই আছেন। নিজে বুঝতে পাচ্ছেন না ?'

'হবে,' অণুভা হাসিমুখে বললে, 'আজ এ-পর্যন্ত একটুও আমি কাশিনি।'

'নিশ্চয়। আর, জ্বর এখন নেই বললেই চলে। লাঙসের অবস্থা ঢের ইম্প্রুভ করেছে। তবু আদুরে গলায় কেবল বলবেন কিনা, ভালো নেই। শুনেছিলুম, আগে বলতেন এই অসুখ হচ্ছে ; এখন শুনছি, মুখে শুধু আপনার এক কথা—ভালো হচ্ছি না।'

হিমাদ্রির গলা তখন প্রায় শাসনে ধারালো হয়ে এসেছে : 'কোনটা ভালো, কোনটা খারাপ, তা আপনি কী জানেন ? আপনাকে যখন আমার হাতে সঁপে দেওয়া হয়েছে, তখন ভালো-মন্দ নিয়ে

আপনাকে অনর্থক মাথা ঘামাতে হবে না। সে আমার কাজ, আমি বুঝব।'

'আপনাকে বলব না তো কাকে বলব, কোনটা ভালো, কোনটা নয়! ডাক্তারের কাছে কি কখনো নিজেকে লুকোনো উচিত?'

'তাই বলে ভালো থাকলেও বলবেন ভালো নেই?'

'আপনাকে বলতে আর বাধা কী বলুন,' অণুভা ভর-ভর করুণ দুটি চোখ তুলে বললে, 'যতক্ষণ আপনি এখানে আমার পাশে বসে থাকেন, ততক্ষণ আপনার ভয়ে পোকাগুলি কুঁকড়ে নির্জীব হয়ে থাকে। গা থেকে দেখতে-দেখতে নেমে যায় জ্বর, শরীরে আসে স্নানের মতো শান্তি, মসৃণ স্নিগ্ধতা। আর যখনই আপনি চলে যান,' অণুভা কষ্টে একটুখানি হাসল: 'পোকাগুলি অমনি আবার অবাধ্য হয়ে ওঠে, আমি বিছানায় একেবারে ভেঙে পড়ি, চারদিকে কিছু আর আমি হাত বাড়িয়ে ধরতে পাই না।'

'বেশ তো, তাই যদি হয়,' হিমাদ্রি এক বিন্দু ব্যঙ্গ

করছে বলে মনে হল না : 'তারো তবে ব্যবস্থা একটা করা যাবে।'

এতগুলি কথা বলে অণুভা হাঁপাচ্ছিল, নিশ্বাস রুদ্ধ করে বললে, 'কী ব্যবস্থা ?'

'কী ব্যবস্থা আবার ! এখান থেকে এক পা-ও তবে নড়ব না।'

'নড়বেন না ? এই রোগা ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে ঘরে দিন-রাত ঠায় বসে থাকবেন ?'

'উপায় কী বলুন ! আমি চলে গেলেই যখন অসুখটা আপনার বাড়ে।'

'তাই বলে অন্ধকারে বসে-বসে আপনিও নিবতে থাকবেন ?' অণুভা এক হাতের আঙুল দিয়ে আরেক হাতের আঙুলের নখ ঘষতে লাগল : 'আপনার আর কোনো কাজ নেই ?'

'আপনাকে ভালো করব, তাই আমার কাজ।' হিমাদ্রি প্রায় একটা গর্জন করে উঠল : 'আমি জ্বলি কি নিবি তা আপনাকে দেখতে হবে না।'

'কেনই বা দেখতে হবে না ?' অণুভা আঙুলগুলির

শীর্ণতার দিকে নত চোখে চেয়ে থেকে বললে, 'আপনারই যদি-বা শেষকালে একটা অসুখ করে— মানুষের শরীর নিয়ে কিছুই তো আপনি জোর করে বলতে পারেন না—'

হিমাদ্রি খোলা গলায় অবিরল হেসে উঠল: 'আমার—আমার অসুখ হবে কী?'

'জানেন, এ-রোগ খুব ছোঁয়াচে?'

'জানি বৈকি।' হিমাদ্রি আরো এক পরদা উপরে উঠে এল: 'তাতে, তাতে আমার কী করতে পারবে? আমি তো আর আপনার নিশ্বাসের কাছে মুখ নিয়ে আসছি না।'

অণুভার উত্তোলিত হাত দুটি আস্তে-আস্তে বিছানার উপর খসে পড়ল। চাদরটা গলা পর্যন্ত তুলে দিয়ে নিজেকে সে সন্তর্পণে গুটিয়ে নিলে। ম্লান, যেন-বা অভিমানী গলায় বললে, 'তাই তো বলছি, আপনি এখান থেকে পালান, পরকে ভালো করার আগে নিজে আত্মরক্ষা করুন।'

'আত্মরক্ষা করব?'

'হ্যাঁ,' অণুভা যেন অন্ধকারে মুছে যেতে-যেতে বললে, 'নিশ্বাস না নিলেই আপনি পার পেয়ে গেলেন এ কথা মনে করবেন না। আমি রুগ্ন, দুর্বল, সব সময় সাবধান আমি না-ও হতে পারি।'

'আপনার কী হয়েছে বলুন দেখি?' হিমাদ্রি চেয়ার থেকে সটান উঠে দাঁড়াল।

'ভয় পেয়ে উঠে পড়লেন তো এরি মধ্যে?' চোখ মেলে অণুভা একটুখানি হাসল: 'হ্যাঁ, তাই তো উচিত, নইলে কে বলুন আপনার মতো অকারণে এমন রোগের আবহাওয়ায় এসে বাসা বাঁধতে ভালোবাসে? আপনি যান, মিছিমিছি নিজেকে এমন বিপন্ন করবেন না।'

'আমি চলে গেলে আপনার কী এমন লাভ হবে, কী আপনি এমন নিরাপদ হবেন?' হিমাদ্রি বিছানায়, অণুভার পাশটিতে এসে বসল।

অণুভার শরীর শুকিয়ে একেবারে পাথর হয়ে গেছে।

'আমি চলে গেলে সেই সঙ্গে যদি আপনার অসুখও

চলে যেত, চেষ্টা করে দেখতুম, তখনই বা সত্যি চলে যেতে পারি কিনা।' গভীর স্নেহে হিমাদ্রি তার শীর্ণ, এলানো হাতের উপর ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল : 'এই তো বলছিলেন, আমি যতক্ষণ পাশে বসে থাকি, আপনি বেশ ভালো থাকেন, আপনার শরীরে কোনো গ্লানি থাকে না, তবে মিছিমিছি আমাকেই বা আপনি চলে যেতে বলছেন কোন সাহসে ?'

অণুভা দুই হাতে মুখ ঢাকল। বোবা গলায় বললে, 'আমি শান্তিতে মরতে চাই, জীবনে এত বড়ো দুঃখের বোঝা নিয়ে আমি চলতে পারব না।'

'মিথ্যে কথা, আপনি মরতে চান আপনাকে কে বললে ?'

'মরতে চাই না ?' মুখের থেকে হাত সরিয়ে অণুভা বিস্ময়ে একেবারে বিভোর হয়ে গেল।

'কক্‌খনো না। প্রতি মুহূর্তে আপনি বাঁচতে চাচ্ছেন, আপনার প্রতিটি নিশ্বাস তা বলছে।'

'কিন্তু বাঁচতে চাইলেই তো দুঃখ।' অণুভা ধরা

গলায় বললে, 'সে-দুঃখ যে আমার কী, তা আপনাকে কী করে বলব ?'

'হোক, তবু আপনার সে-দুঃখ মৃত্যুর শান্তির চেয়ে ঢের বড়ো জিনিস।' হিমাদ্রি হঠাৎ তার হাত ধরে উন্মুক্ত ডাক দিল : 'নিন, উঠুন, মিছিমিছি শুয়ে আছেন কেন ? আপনার কি হয়েছে ?'

'আমার কিছুই হয়নি ?'

'না, আমি বলছি, কিছুই হয়নি। উঠে বসুন, জানলা দিয়ে চেয়ে দেখুন একবার বাইরে।'

'উঠে বসব ?' অণুভা হাত বাড়িয়ে হিমাদ্রিকে ধরতে গেল। হিমাদ্রি নিল হাত সরিয়ে। বললে, 'না, আপনি একলাই পারবেন।'

অণুভা কাতরতায় পড়ল এলিয়ে।

'পারবেন, আমি বলছি, একশোবার পারবেন।' হিমাদ্রি যেন তাকে তিরস্কার করছে : 'কারু সাহায্য আপনার নিতে হবে না, আপনি একাই অনেক, পারবেন, উঠে পড়ুন। এই তো, এই আমি আপনার কাছে আছি দাঁড়িয়ে।'

যেন প্রায় নিশি-পাওয়ার মতো অণুভা মুগ্ধ মুখে আস্তে-আস্তে উঠে বসল।

পিঠের দিকে তাড়াতাড়ি বালিশগুলি জড়ো করে দিয়ে হিমাদ্রি ছেলেমানুষের মতো উচ্ছ্বসিত হেসে উঠল: 'বলুন, আপনি ভালো নেই! ইচ্ছে করলে, শরীরে-মনে ইচ্ছে করলে কী না আপনি করতে পারেন?'

'বিছানায় সামান্য এই উঠে বসা ছাড়া আর কিছুই করতে পারি না।' অণুভা আস্তে-আস্তে বালিশে হেলান দিল: 'কিন্তু, মনে আছে, একদিন আমি স্বচ্ছন্দে ঐ বারান্দা পর্যন্ত হেঁটে আসতে পারতুম।'

'তেমনি একদিন ছিল, আপনার মনে আছে কিনা জানি না, আপনি সিঁড়ি দিয়ে জলের মতো নিচে নেমে যেতে পারতেন। সে-কথা হচ্ছে না। আজ কত দিন হল বিছানা থেকে এক ইঞ্চি ওঠবার আপনার নাম নেই, একেবারে মাটি কামড়ে পড়ে আছেন। কিন্তু আজ এক কথায়, মনের একটিমাত্র সঙ্কল্পে আপনি উঠে বসতে পেরেছেন।'

'সে আপনি এত করে বললেন বলে তো!' অণুভা হাসল : 'আশ্চর্য, একটা প্রায় আপনি অসাধ্যসাধন করলেন, বলা যায়।'

'নিশ্চয়। অসাধ্যই যদি না সাধন করব, তবে আমি কেন?'

অণুভা পুলকিত বিস্ময়ে হিমাদ্রির মুখের দিকে চেয়ে রইল। একবার মনে হল অলস এই বসা থেকে এখুনি যেন সে উঠে দাঁড়াতে পারবে, চঞ্চলতায় ছিটিয়ে পড়তে পারবে চারদিকে। নিজেকে যেন সে বহুকষ্টে দমন করল; কি ভেবে অন্তরঙ্গতায় গম্ভীর হয়ে বললে, 'আচ্ছা, আপনার এখনো মনে হয়, আমাকে ভালো করতে পারবেন?'

'দিনের এই আলোর মতো মনে হয়, আমার এই উপস্থিতির মতো। কিন্তু একা কী আমি করতে পারি, যদি আপনি না আমাকে সাহায্য করেন?'

'কেন, এই যে আমি উঠে বসলুম, আমাকে তো আপনার কোনো সাহায্য নিতে দিলেন না।'

'কিন্তু আপনার উঠে-বসার পেছনে আমার ভয়ঙ্কর,

প্রায় একটা পৈশাচিক ইচ্ছা ছিল যে আপনি ঠিক উঠে বসবেন। অথচ, আপনাকে আমার এই ভালো করার পেছনে আপনার ভালো-হয়ে-ওঠার অদম্য ইচ্ছা নেই।'

'নেই?' অণুভা যেন টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে।

'না, আপনি বাঁচতে চান না।'

'চাই না?' অণুভা হঠাৎ বাহুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল: 'তবে এত দিন আমাকে পরীক্ষা করে আপনি কী বুঝলেন? ভীষণ, ভীষণ বাঁচতে চাই। কিন্তু, কেন, বলতে পারেন, কেন আমি বাঁচব, কিসের জন্যে?'

'নিজের জন্যে।' হিমাদ্রি নির্ধূম একটা শিখার মতো কেঁপে-কেঁপে উঠল: 'মানুষে আবার কিসের জন্যে বাঁচে? শুধু বাঁচতে পারাটাই তো তার অলৌকিক কীর্তি।'

'কিন্তু—'

কি কথা বলতে গিয়ে অণুভা থেমে পড়ল।

'বলুন, ডাক্তারের কাছে কিছুই তো আপনার লুকোনো চলবে না।'

'কিন্তু,' অণুভা শরীর থেকে সম্পূর্ণ মুছে যেতে-যেতে বললে, 'কিন্তু আমি বেঁচে উঠলে, ভালো হয়ে উঠলে আপনি তো আর আসবেন না।'

'না-ই বা এলুম।' হিমাদ্রি দীপ্ত কণ্ঠে নির্মল হেসে উঠল: 'আপনার বেঁচে-ওঠার কাছে আমার যাওয়া-আসার কী দাম! আপনার জীবনে কত লোক যাবে-আসবে, আপনার সে উত্তাল বিচিত্রতার কাছে আমি কে, আমি কতটুকু! গেলুমই বা না হয় ডুবে যদি আপনাকে তবু সমুদ্রের পারে দাঁড় করিয়ে দিতে পারি!'

অণুভা হঠাৎ কেঁদে উঠল। রাতের অন্ধকারে ঘুম-ভাঙা শিশুর মতো।

বললে, 'আমাকে তবে বাঁচান। পৃথিবীতে এ-পর্যন্ত কোটি-কোটি লোক মরেছে, কোটি-কোটি লোক মরবে, তবু, আমি মরব, এর মতো একলা, এর মতো শূন্য আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না।

মরার চাইতেও বাঁচায় বেশি রহস্য। আমাকে বাঁচান।' হাত দুটো শূন্যে তুলে ধরতে গিয়ে অণুভা আবার তাড়াতাড়ি নামিয়ে আনল : 'কিন্তু কেনই বা আমাকে বাঁচাবেন ? আমি কে ?'

'কে আবার !' হিমাদ্রি ফের চেয়ারের উপর বসে পড়ল ; অপার সরলতায় উদ্ভাসিত হয়ে বললে, 'আপনাকে যখন ভালো করতে হবে, তখন আপনিই আমার সব।'

'কিন্তু, আশ্চর্য, স্বচক্ষে দেখেও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না,' অণুভা যেন ভোর-রাতের স্বপ্নের মধ্যে থেকে বললে, 'একটা রুগ্ন, কুৎসিত, অশুচি মেয়ের জন্য আপনি কিনা এমন প্রাণপাত করছেন।'

'কি করে পারবেন, আপনি তো আর আমার চোখে দেখছেন না।'

'কিন্তু আমি একদিন ভারি সুন্দর ছিলুম।'—বালিশের তলা থেকে অণুভা এলবামটা খুঁজে বার করতে গেল।

'মিথ্যে কথা।' হিমাদ্রি এলবামটা ঠেলে সরিয়ে

দিয়ে বললে, 'সেদিন আপনার বাঁচবার এই তীব্র পিপাসা ছিল না। সেদিন আপনি বাঁচতে চেয়েছিলেন নানারকম প্রসাধনে, পুলকিত পাতার প্রচুরতায়, নয় এই মাটির তলাকার সুদূর-সন্ধিৎসু শিকড়ে। আজ আর আপনি কিছু চান না, শুধু বাঁচতে চান—এই বাঁচাটাই সব চেয়ে সুন্দর, সব চেয়ে পবিত্র।'

আশ্চর্য, বাঁচবার এই আশরীর, অনির্বাণ ইচ্ছা সত্ত্বেও অণুভার গা ঝেড়ে ওঠবার নাম নেই।

অথচ হিমাদ্রি কিনা তাকে এখনো ভালো করবে।

সমস্ত ব্যাপারটা সব চেয়ে বিসদৃশ লাগে বিনীতার কাছে। প্রায়ই সে আজকাল আসে, এবং এমন সময়েও নিশ্চয় আসে যখন হিমাদ্রি রয়েছে। আর হিমাদ্রির অবস্থিতিটা যখন কার্যকারণে সংক্ষিপ্ত নয়, তখন বিনীতাই বা কি করে তাড়াতাড়ি বিদায় নেয়। কেননা আজকাল রুগীর চেয়ে ডাক্তারই তার কাছে বড়ো কৌতূহল। তার জন্যে বিনীতার করুণা হয় দস্তুরমতো, প্রায় একটা ঘৃণামিশ্রিত করুণা। সুস্থ

শরীরে ভাবতেই পারে না সে, যে, কেউ, বিশেষ করে এমন একজন নাম-ডাকওয়ালা ডাক্তার, তার সমস্ত কাজ-কর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে অবধারিত একটা মৃত্যুর শিয়রে এসে বসে থাকবে। তবু যদি বোঝা যেত, তাতে তার পকেটগুলি অন্তত স্ফীত হয়ে উঠছে।

এই অসুস্থ নিঃস্বার্থতার যে কী অর্থ থাকতে পারে, বিনীতা তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। ঠোঁট টিপে নিজের মনেই সে হেসে ওঠে, এমনিতরো একটা কদর্য মুমূর্ষুতার মাঝে কী যে রয়েছে আকর্ষণ! মরতে বসেছে একটা মেয়ে, শিকড়ের মতো রিক্ত কখানা হাড়, তার উপরে শুধু একটা চামড়ার পোঁচ দেওয়া—এত বড়ো সংসারে ডাক্তারের কাছে এর চেয়ে আর কিনা কোনো রূপ নেই, আর কোনো রহস্য। তার জন্যে ছেড়েছে সে তার প্র্যাকটিস, তার বাইরের প্রয়োজন, উত্তাপে গুটিয়ে এনেছে তার উড্ডীন দুই পাখা। যে-হাতে তার অপারেশন করবার কথা, সেই হাতে কিনা সে কপালে কোমল হাত বুলিয়ে

দিচ্ছে। অহেতুক রাগে বিনীতার আপাদমস্তক অস্থির হয়ে উঠল। অণুভা মরুক তাতে ক্ষতি নেই, বিনীতাও একদিন মরবে, কিন্তু ডাক্তারের নিঃসংশয় হার সে স্বচক্ষে দেখতে চায়। তার অমানুষিক এই দম্ভ সে আর সহ্য করতে পারছে না।

তাই, গোড়াতেই বলেছি, রুগীর চেয়ে ডাক্তারই তার কাছে বেশি করে একটা কৌতূহলের বিষয় হয়ে উঠেছে। তাই প্রায় রোজই একবার তার আসা চাই।

অণুভার সম্বন্ধে কবে থেকে যে এমন একটা তার অবিচ্ছেদ্য আকর্ষণ জন্মেছে তার সন্ধান করা আর সম্ভব নয়। কিন্তু সত্যি করে বলতে গেলে, বিনীতা তার মনের সঙ্গে লুকোচুরি করতে ভালোবাসে না, অণুভার মৃত্যুর মধ্যে ডাক্তারের এই পরাভবটাই তার কাছে দেখবার জিনিস।

বিকেলের দিকে অণুভাকে আজ সে একলা পাবে ভেবেছিল, এবং যত বড়ো ডাক্তারই হোক, হিমাদ্রি রায়ের চিকিৎসাতে যে তার কিছু হচ্ছে না, ভেবেছিল

সবিস্তারে সে-কথাটাই সে আজ প্রমাণ করবে। কিন্তু গলি জুড়ে দরজার কাছে ডাক্তারের মোটর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিনীতার সমস্ত শরীর রি-রি করে উঠল। আশ্চর্য, সময়ের একটা সীমাও সে আর মেনে চলছে না।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যেতে বুক তার দুলে উঠল একবার, হয়তো তারি জন্যে এমনি অসময়ে তাকে এসে পড়তে হয়েছে। যতদূর সম্ভব নিজেকে সঙ্কীর্ণ করে সে ঘরে ঢুকল। কিছুই ভয় করবার নেই, ক্লান্ত আলস্যে ফুরিয়ে-আসা সুরের রেশের মতো অণুভা আছে শুয়ে, আর তার বিছানার ধারে দরিদ্র একটা সেই লোহার চেয়ারে বসে ডাক্তার নিশ্চিন্ত প্রশান্তিতে হয়তো মৃত্যুর মাধুরী দেখছেন। দুজনের মাঝে স্তব্ধতা উঠেছে ফেনায়িত হয়ে—এত ভীষণ স্তব্ধতা যে বিনীতার ত্বরিত ঘরে-ঢোকার শব্দেও তাতে একটি রেখা ফুটল না।

'আজ কেমন আছ, অণু?' বিনীতার প্রশ্নটা যেন হিমাদ্রির কাছে গভীর উপেক্ষার মতো শোনাল।

তার চেয়েও উপেক্ষা বাজল যেন অণুভার গলায়, যখন সে বললে, 'জানি না। উনি, সব উনি বলতে পারেন।'

'হ্যাঁ, আমিই তো জানি।' হিমাদ্রি বলিষ্ঠ, স্মিত মুখে বললে, 'রুগীকে কিছু জানতে না দেওয়াই আমাদের কাজ। আর যে-ই জানুক, রুগী যেন কিছু জানতে না পায়। কিছুই ভাববার নেই, উনি এখন বেশ ভালো আছেন।'

'মিথ্যে কথা,' অণুভা প্রায় একটা আর্তনাদ করে উঠল : 'মিথ্যে কথা, বিনু।'

বিনীতা তার শাড়ির টানগুলি যথাসম্ভব দলিত না করে অণুভার পায়ের দিকে এসে বসল। বললে, 'ডাক্তাররা মিথ্যে কথা বলতেই তো ওস্তাদ।'

'তাই ডাক্তার আমি আর চাই না, বিনু,' অণুভা যেন ডুবে যেতে-যেতে বললে, 'তারা বেশি কথা কয়, অনেক দেরি করে, অকারণ দুর্বল করে দেয়।'

'চান না?' হিমাদ্রি আহত হবার ভান করলে।

'না, চাই না,' শান্ত, করুণ গলায় অণুভা যেন কেঁদে

উঠল : 'এমন একজনকে চাই যে আপনার চেয়ে অনেক দ্রুত, অনেক দুর্দান্ত, অনেক নির্দয়। যে কখনো কোনোদিন মিথ্যে কথা বলে না, বিশ্বাস-ঘাতকতা করে না, আশা দিয়ে সে-আশা মেটাবার জন্যেও যে প্রস্তুত নয়।'

হিমাদ্রি চেয়ার থেকে সটান উঠে পড়ল : 'কে সে?'

'মৃত্যু।'

'যাক, আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিলেন।' রুমালে কপালের ঘাম মুছতে-মুছতে হিমাদ্রি চেয়ারে ফের বসে পড়ল।

'কিন্তু, অণুভার বর্তমান এই অবস্থাটা কি যথেষ্ট আপনাকে ভাবিয়ে তুলছে না বলতে চান?' বিনীতা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল : 'এতদিন ধরে আপনি ওর কী করতে পারলেন?'

'কিছু না।' অণুভা অত্যন্ত শাদাসিধে, সহজ গলায় বললে : 'কোটিতম ভগ্নাংশের একটা বিন্দুও না। মাঝের থেকে কী কতগুলো ওষুধ-বিষুধ খাইয়ে

খামোকা আমাকে মরতে কতদিন দেরি করিয়ে দিলেন। এমন টানাহেঁচড়া না করলে কবে আমি ভালো হয়ে যেতুম। মিছিমিছি এই ভোগান্তি, অনর্থক শুধু এই দ্বিধায় ঝুলিয়ে রাখা।'

'এবার তোর ডাক্তার বদলানো দরকার, অণু।' বিনীতা নির্বিঘ্নে বলতে পারল।

'দরকার, না?' অণুভা স্বচ্ছন্দে বললে, 'আমিও তো ওঁকে তাই বলছি, কিন্তু শোনেন না যে। ডেকে যেমন আনিনি, তেমনি মুখের ওপর চলে যেতেও তো বলতে পারি না। নিজেরই তো বোঝা উচিত, কী বলো, বিনু?'

'ডেকে আনেননি আপনি?' হিমাদ্রি ছটফট করে উঠল।

'ডেকে এনেছিলুমও-বা যদি বলতে চান,' অণুভার হাসি ক্ষীণ একটু শঙ্খের রেখায় বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ল: 'দিনের পর দিন ঘর জুড়ে এমনি বসে থাকতেও বলিনি কখনো।'

'তবে আপনি আমাকে এতদিন বাদে এখন, আজ,

চলে যেতে বলছেন ?' হিমাদ্রি যেন শূন্যে দাঁড়িয়ে কথা বললে।

'এতদিন বাদে বলেই তো বলা।' অণুভার মুখের থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বিনীতা বললে, 'আপনাকে তো আর কম সময় দেওয়া হয়নি, এক মাসের ওপর। অনেকদিন তো দেখলেন, চেষ্টাও করলেন বহু, কিন্তু কিছুই যখন করা গেল না, তখন অন্য ব্যবস্থা করা কি উচিত নয় ?'

'নিশ্চয় উচিত।' অণুভা পুরোপুরি সম্মতি দিলে।

'আমি হলে তো ভাই পারতুম না অনর্থক একজনের হাতে এমনি পড়ে থাকতে। এ-ব্যাপারে আমার যদি কোনো ক্ষমতা থাকত—'

'আমার ক্ষমতা নেই বলে আমার ওপর কী অন্যায় সুবিধেই যে নেওয়া হচ্ছে!' অণুভা গলায় বিদ্রূপের ঝাঁজ আনবার চেষ্টা করল: 'নইলে বলো, পৃথিবীর কোনো সুস্থ, সবল লোকের কথা তুমি ভাবতে পার বিনু, যে, তার সকল কাজ-কর্ম আশা-আকাঙ্ক্ষা ফেলে এই শুকনো, জীর্ণ, তুচ্ছ একটা রুগীর পাশে

তার অমূল্য সময় ব্যয় করতে বসবে ? নিশ্চিত যে মরবে, নিশ্চিন্তে তাকে মরতে দিতে দেবে না।'

অণুভাকে দলে পেয়ে বিনীতা নিজেকে বেশ সুরক্ষিত মনে করল। অনুকম্পায় নাকটা একটু কুঁচকে সে জিগগেস করলে : 'আপনার কল-টল বিশেষ কিছু আর আসে না বুঝি ?'

'কই, দেখি না তো।' হিমাদ্রির গলায় এতটুকু একটা রেখা নেই।

'কী করে বা আসবে !' অণুভা টিপ্পনি কাটল : 'দিনে-রাত্রে ডাক্তারের দেখা পেলে তো ! ডিসপেন-সারিতে তো শুনি তালা পড়েছে। ঢুলি দিয়ে শহরে ঢ্যাড়া পিটিয়ে দেওয়া হয়েছে, ডাক্তারবাবু আজকাল রুগী-সারানো ছেড়ে ভূত-নামানো শিখছেন, তাঁর দেখা মিলবে না।'

কথাটা বিনীতা কানে তুললো না, বললে, 'এরি মধ্যে দৈবাৎ যদি-বা এক-আধটা আসে, কি করেন ?'

'খুব কিছু কঠিন না হলে ফিরিয়ে দিই।'

'এদিকে, দেখলে তো বিনু, দেমাক আছে ষোলো

আনা।' অণুভা হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু গলায় আওয়াজ ফুটল না : 'কিন্তু তাঁকে জিগগেস কর তো, কঠিন কেস-এ কত করে উনি ফি পান ?'

'খুব বেশি কঠিন হলে ফি আমি একেবারেই নিই না।' হিমাদ্রি উদার ঔদাস্যে বলে উঠল : 'তাকে যে ভালো করতে পারব, সে-ই আমার একমাত্র আনন্দ, একমাত্র আকর্ষণ।'

'এই তো সেই ভালো করবার নমুনা!' বিনীতার বাঁকানো ঠোঁটের কোণে ছোট একটি ঠাট্টা উঁকি মারল বোধহয়।

'কিন্তু কেনই বা ফি আপনি নেবেন না শুনি ?' অণুভা অস্থির হয়ে উঠল : 'কেনই বা অন্য রুগী আপনি ফিরিয়ে দেবেন ?'

'আমার খুশি।'

'কিন্তু রুগীরও তো খুশি হতে পারে,' বিনীতা বললে, 'যে, উপযুক্ত ফি না দিয়ে সে চিকিৎসিত হবে না। ডাক্তার হচ্ছে রুগীর একজন এমপ্লয়ি, তাকে ন্যায্য রিমুনারেশন না দিয়ে সে তার সেবা

নেবে কেন? মিছিমিছি পরের কাছে ঋণ বাড়িয়ে তার লাভ কী?'

'সে-কথা আমি একেবারেই ভেবে দেখিনি।' হিমাদ্রি কঠিন হয়ে বললে, 'আমার ধারণা ছিল ডাক্তারের কাজ আরো মহত্তর।'

'ডাক্তারের কাজ হচ্ছে নিজেকেই রুগী করে তোলা।' অণুভার মুখ বেদনায় বিশীর্ণ হয়ে এল : 'ক্ষয় পেয়ে-পেয়ে শীর্ণতায় শূন্য হয়ে যাওয়া। ঋণ, ঋণের কথা আমি ভাবি না, বিনু, জীবনের যেখানে যত কিছু ঋণ সব আমি আমার মৃত্যুতে শোধ করে যাব। কিন্তু, কেন,' অণুভা হিমাদ্রির মুখের উপর অনর্গলতায় ছিটিয়ে পড়ল : 'কেন আপনি দিনের পর দিন রোগা, এঁদো, নোংরা এই একটা বন্ধ ঘরের আবহাওয়ায় নিজেকে নির্জীব করে আনবেন, কিসের প্রলোভনে? আপনার ভবিষ্যৎ, আপনার সম্ভাবনা, আপনার স্বপ্ন—সমস্ত বিসর্জন দিয়ে কেন আপনি প্রতি ক্ষণে একটু-একটু করে এই রোগশয্যার দিকে এগিয়ে আসছেন? ঠিকই তো বলেছে বিনু,

আপনার আর কোনো কাজ নেই, কামনা নেই, আপনি দিন-দিন অকর্মণ্য হয়ে পড়ছেন।'

'থামুন।' ডাক্তারি গলায় হিমাদ্রি একটা ধমক দিলে।

'থামব তো বটেই, কিন্তু আপনারও এবার থামা উচিত।' অণুভার কাঁধে আজ হঠাৎ ভূত এসেছে, তেমনি অসহিষ্ণু, অশরীরী গলায় সে বললে, 'নইলে, কেন, কেন আপনি ফি নেবেন না, আপনি কি ডাক্তারি করতে বসছেন সন্নেসি সাজতে নাকি? বিলেত থেকে এত যে ডিগ্রি নিয়ে এলেন, সব বিনি-পয়সায়? যে-রুগী দুই হাতে টাকা নিয়ে আপনাকে সাধছে, তাকে আপনি কোন লজ্জায় ফিরিয়ে দিচ্ছেন জিগগেস করি? আপনার কি বড়ো হবার, বিখ্যাত হবার কথা নয়?'

'ঢের বড়ো-বড়ো কথা বলেছেন, এবার চুপ করুন বলছি।' হিমাদ্রি শাসনে প্রায় অনাবৃত হয়ে উঠল: 'এখনো আশা ছিল, চেঁচিয়ে সব মাটি করে দেবেন না।'

'এখনো আশা ছিল ?' অণুভা স্পষ্ট ঠাট্টা করলে।

'কিন্তু দেখুন, আর যাই বলুন,' বিনীতা যতদূর সম্ভব সভ্য, সংযত গলায় বললে, 'রুগীর পছন্দ-অপছন্দ, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথাটা ডাক্তারের দেখা উচিত। অণু যখন আর চায় না, তার যখন আর এলোপ্যাথিতে বিশ্বাস নেই, তখন তাকে এবার ছেড়ে দেওয়াই উচিত। রুগীর ইচ্ছেটাই সবাইর আগে দেখতে হয়।'

বিনীতা ভেবেছিল এর পর বুঝি আর কোনো কথা থাকতে পারেনা। কিন্তু আশ্চর্য, কথাটা হিমাদ্রি যেন উড়িয়ে দিল ; বললে, 'রুগী, রুগী কী বোঝে বলুন ? সে কী জানে তার কোনটা পছন্দ, কোনটা নয় !'

'যথেষ্ট জানি, আর জানি বলেই আপনাকে আমি আর প্রশ্রয় দিতে পারি না।' অণুভা দুই হাতে মুখ ঢাকল।

হিমাদ্রি ব্যস্ত হয়ে বললে, 'দয়া করে আপনি এখন চুপ করবেন কিনা বলুন। এ-রকম করলে আপনার অসুখ যে আরো বেড়ে যাবে।'

'তবে আপনিই তো দেখছি তার অসুখ বাড়বার

কারণ।' বিনীতা নিপুণ একটি টিপ্পনি কাটল : 'আর, এ, এ-ও তো আমি ভেবে পাই না ডাক্তারবাবু, রুগী নিজে যখন আপনার ওপর হতাশ হয়ে চিকিৎসা বদলাতে চাচ্ছে, তখনো আপনি কিনা জোর করে তার ওপর প্রভুত্ব খাটাচ্ছেন।'

'আমি নিতান্ত দুর্বল বলেই আমার এই অত্যাচার সইতে হচ্ছে, বিনু।' অণুভা দেয়ালের দিকে কষ্টে পাশ ফিরল।

'অসম্ভব এই ঔদ্ধত্যকে প্রশ্রয় দেওয়া—অণুভা ঠিকই বলেছে।' বিনীতা রাগে ঝলমল করে উঠল : 'রুগী যদি শেষ পর্যন্ত তার চিকিৎসক বদলাতে চায়, যদি আরো একবার নতুন করে সে বাঁচবার পথ খোঁজে, আপনি তাতে বাধা দেবেন নাকি?'

'বাধা না দিয়ে উপায় কী?' হিমাদ্রি শান্ত, গম্ভীর মুখে বললে, 'রুগী যদি এখন শখ করে একটা কুপথ্য করতে চায়, আমি ডাক্তার হয়ে তাতে সায় দিতে পারি নাকি?'

বিনীতা পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে বললে, 'তার মানে,

আপনি বলতে চাচ্ছেন, এত বড়ো শহরে যে-কোনো অসুখ সম্বন্ধে আপনিই শেষ কথা ?'

'হ্যাঁ, বিশেষ করে ওঁর এই অসুখ। জানেন, শুধু আমিই ওঁকে ভালো করবার স্পর্ধা রাখি।'

'আর এই তো আপনার কীর্তি। ওকে একেবারে শেষ করে তবে ভালো করবেন। বেচারাকে বাঁচবার আরেকটা সুবিধে পর্যন্ত দিতে চান না।' তার স্বরে বিনীতা এবার একটা সমাপ্তির রেখা টানল : 'কিন্তু আপনাকে আর স্পর্ধা দেখাবার সুবিধে দেওয়া হতে পারে না, ডাক্তারবাবু। আপনার খেয়ালের চেয়ে আমাদের প্রাণ অনেক বড়ো জিনিস।'

'কিন্তু,' হাসতে-হাসতে হিমাদ্রি উঠে দাঁড়াল, 'কিন্তু এখন কি করেই বা আমি যাই ? এতটা পথ এগিয়ে এনে এখন তো আর এঁকে ছেড়ে দিতে পারি না।'

'রুগী নিজে আপনাকে না চাইলেও নয় ?' বিনীতাও মনে হল এখুনি উঠে দাঁড়াবে : 'এতো স্পষ্ট করে যে আপনাকে ওর মত জানাল, তার আপনি কোনো দামই দিতে চান না ?'

'কি করেই বা দেব বলুন ? অবুঝ রুগী কত কথাই তো বলে, বিশেষ করে এই রোগে স্নায়ুগুলি সব সময়ে একটু উচ্চকিত থাকে, এই অবস্থায় রুগীর কথায় কান দিলে কি চলে কখনো ?'

'কিন্তু আমি যদি এখন,' অণুভা দ্রুত পাশ ফিরল, রুদ্ধ নিশ্বাসে বললে, 'আমি যদি এখন আরো স্পষ্ট করে আপনাকে আমার এ-ঘর থেকে চলে যেতে বলি, আপনি জোর করে ঐ চেয়ার জুড়ে বসে থাকতে পারেন নাকি ?'

হিমাদ্রি স্তব্ধতায় একেবারে দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেল।

'ঢের আমি সহ্য করেছি, অনেক দুঃখ, অনেক নিরাশা,' অণুভা বিছানায় মিশে যেতে-যেতে বললে, 'কিন্তু আর নয়, আর আমি নিজেকে নিয়ে এই প্রতীক্ষায় দুলতে পারি না। আপনি চলে যান, চলে যান এখান থেকে।'

'চলে যাব ?' হিমাদ্রি যেন আকাশ থেকে খসে পড়ল।

'হ্যাঁ, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আপনি কী করবেন? আমি যদি মরতেই চাই, আমার মৃত্যুকে আপনি বাধা দিতে পারবেন নাকি?'

'আপনি কী বলছেন আপনি জানেন না।'

'এখনো নয়?' বিনীতা উঠল হেসে।

'আর আমাকে না-জানিয়ে রেখে লাভ নেই।' অণুভা ঠিক হাসল না কাঁদল বোঝা গেল না: 'আমার সকল গেছে, মরবার এই শেষ স্বাধীনতাটুকু আমি হারাতে পারব না। সেই স্বাধীনতায় কারুর হস্তক্ষেপ আমার অসহ্য।'

'তবু, এখনো সময় ছিল, আরেকবার ভেবে দেখুন।'

'যেটুকু সামান্য সময় এখনো হাতে আছে,' বিনীতা বললে, 'ভালো করে ভেবেই দেখতে হবে বৈকি, কাকে তারপর ডাকা যায়।'

'না, আর আমি ভাবব না, আমি এবার নিজেকে ছেড়ে দেব, ঘুমিয়ে পড়ব এবার।' অণুভার চোখ ক্লান্তিতে ভিজে এল: 'যান, ঘুমুতে দিন আমাকে। পৃথিবীতে এই একটাই কেবল রুগী নয়। আর পৃথিবী

নয় শুধু এই বন্ধ একটা ঘর। ও কি, দাঁড়িয়ে আছেন কি এখনো ?'

'কিন্তু আপনার এখন একবার ওষুধ খাবার সময় হয়েছিল যে।' হিমাদ্রি এক পা থামল।

'ওষুধ ? ও! হ্যাঁ, দিন।' অণুভা হাত বাড়াল।

ওষুধ ঢেলে ছোট ফিডিং-কাপটা হিমাদ্রি তাড়াতাড়ি অণুভার হাতে এগিয়ে দিল।

এবং মুহূর্তমাত্র দৃকপাত না করে অণুভা সেটা ছুঁড়ে মারল মেঝের উপর। একটা পলক পর্যন্ত পড়ল না।

হিমাদ্রি আস্তে-আস্তে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

এবং, কী আশ্চর্য, বিনীতাও হঠাৎ উঠে পড়েছে।

'এ কী, তুমি চললে কোথায় ?' কাঁচের ভাঙা টুকরোর মতো অণুভা উঠল হাহাকার করে।

'যাই,' দ্যুতিমান দীর্ঘতায় বিনীতা ঝকঝক করে উঠল : 'অনেক ওঁকে কড়া-কড়া কথা বলেছি, যাই, ওঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে আসিগে।'

খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে আসতে পারলে সে বাঁচে।
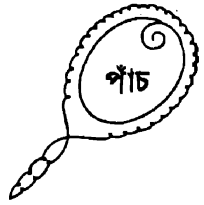
পর দিন, অনেকদিন পর, হিমাদ্রি তার সমবেত রুগীদের দিকে মুখ তুলে চাইল। শুধু পরকেই তার ভালো করতে হবে, কেননা ডাক্তারের নিজের আবার অসুখ কী! হায়, সংসারে ডাক্তারেরই কেবল ছুটি নেই। পরের ইতিহাস নাও, পরের যন্ত্রণা খোঁজ : এর অতিরিক্ত তোমার আবার কী পরিচয় আছে!

হিমাদ্রি পরের দুঃখের মধ্যে নিজের দুঃখ ভুলতে গেল।

হঠাৎ, বেলা তখন প্রায় দশটা, হিমাদ্রির কল-এ বেরুবার সময়, দেখতে-গরিব, আধা-বয়সী একটা লোক ত্রস্ত পায়ে ঘরে এসে ঢুকল।

‘ভীষণ অসুখ, আপনাকে এক্ষুনি একবারটি যেতে হবে।’

আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনা হয়তো। হিমাদ্রি ব্যস্ত হয়ে জিগগেস করলে : ‘কী হয়েছে?’

‘তা জানি না, তা আমাকে কিছু বলে দেয়নি।’

‘বলে দেয়নি?’

‘না। শুধু বলে দিয়েছে, ভীষণ অসুখ, আপনাকে এক্ষুনি দরকার।’

‘কাদের বাড়ি? ঠিকানা কী?’

আগন্তুক ঠিকানা বললে।

হিমাদ্রি চমকে উঠল : ‘কার অসুখ?’

‘তা-ও জানি না।’

‘তা-ও জানো না?’ হিমাদ্রি ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললে, ‘কে বলে দিয়েছে তোমায় আমাকে ডেকে নিয়ে যেতে?’

‘দিদিমণি।’

‘দিদিমণি? তুমি সে-বাড়ির কে? ঠিকানা ভুল করোনি তো?’

'চাকর। আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই দেখুন কাগজেলেখা ঠিকানা।'

'আচ্ছা, বলে দিয়ো যাচ্ছি।'

'একটু শিগগির যাবেন।'

যেতে-যেতে হিমাদ্রির প্রায় বারোটা বাজল। পথে যেতে-যেতে দু-চারটে জরুরি কল্ সে সেরে নিয়েছে। সেই অবিচিত্র প্রাত্যহিকতা। তার ছুটি নেই, রাত বারোটা বাজলেও নয়। ডাকলেই তাকে হাজিরা দিতে হবে, আর মুখ ফুটে একবার বললেই হল : 'তোমাকে আর দরকার নেই।'

গাড়ি-বারান্দায় বিনীতা এসেছে বেরিয়ে। তার চেহারা দেখে মনে হয় না, এটা দুপুর। সাজগোজ দেখে মনে হয় বাড়িতে যেন কি-একটা আজ উৎসব শুরু হয়েছে। হিমাদ্রি কুণ্ঠিত হয়ে বললে, 'আপনাদের বাড়িতে নাকি কার অসুখ ?'

'তা ছাড়া কি প্রকাণ্ড ডাক্তাররা আর এমনি পদার্পণ করেন ?' বিনীতা স্নিগ্ধ অভিবাদনের সুরে বললে।

'কার অসুখ ?'

'কার আবার ! আমার।'

'আপনার ?' হিমাদ্রি পাথরের মূর্তিতে নিষ্পলক চেয়ে রইল।

'কেন, আমার কি অসুখ হতে নেই ?' বিনীতা হেসে উঠল : 'আমি কি মানুষ নই ?'

'না, তা নয়,' হিমাদ্রি নিজেকে তাড়াতাড়ি সংশোধন করল ; স্বচ্ছন্দ, অমায়িক গলায় বললে, 'কিন্তু কী এমন অসুখ আপনার হতে পারে ? দেখে তো কিছু মনে হচ্ছে না।'

'আর যাই হোক, ডাক্তারের চোখকে প্রশংসা করতে পারি না। দেখে তারা কতটুকুই বা বুঝতে পারে ?' হাতের মৃদু একটি হেলনে বিনীতা ইশারা করল : 'আসুন। ব্যস্ত কী, বলছি। আর যাই হোক, ডাক্তারের কাছে তো কিছু লুকোনো চলবে না।'

হিমাদ্রি অসম্ভব অবাক হয়ে গেল। কাল বিকেলেও তাকে যতটা সজীব দেখাচ্ছিল, এখন যেন সে তারও

চেয়ে নতুন। সমস্ত চেহারায় ম্লান একটি রেখায় অসুখের কথা কোথাও লেখা নেই। আগাগোড়া সরল স্বচ্ছন্দ একটি প্রসন্নতা দিয়ে সে তৈরি। খানিক আগে স্নান করে এসেছে বলে ভিজে চুলের ঢেউ কাঁধ ঝেঁপে পিঠের উপর ছড়িয়ে পড়েছে।

'এরি মধ্যে কী আপনার হঠাৎ অসুখ করে বসল ভেবে পাচ্ছি না।' হিমাদ্রি এ-ঘর থেকে ও-ঘরে এগোতে-এগোতে বললে, 'কাল বিকেলে আপনাকে দেখলুম।'

'এখনো দেখছেন।' বিনীতা শান্ত মুখে হেসে উঠল: 'অসুখ কি হাতের রেখায় লেখা থাকে? তাকে পরীক্ষা করে বুঝতে হয় ডাক্তারদের। আর, আপনি এত বড়ো ডাক্তার! আসুন। হাসছি বলেই কি আমি কি খুব সুস্থ আছি নাকি?' বিনীতা আবার হাসল: 'এক মুহূর্তে মানুষের কত কী হয়ে যেতে পারে, তায় কাল বিকেলে আপনার সঙ্গে দেখা হবার পর আমার প্রকাণ্ড একটা রাত কেটে গেছে।'

কাল বিকেলে ও-বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে নিচে গাড়িতে ওঠবার সময় হিমাদ্রি পিছনে দ্রুত পায়ে মানুষের আওয়াজ শুনে থমকে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল কার যেন একটি রুদ্ধশ্বাস ব্যাকুলতা তাকে ডেকে নিয়ে যাবার জন্য ছুটে আসছে। তাকিয়ে দেখল, আর কেউ নয়, বিনীতা। সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে আসার দরুণ চাপা, আরক্ত মুখে হাসছে।

'আপনি এখুনি চললেন নাকি ?'

হিমাদ্রি কথা বলল না।

রাস্তায় আরেক পা নেমে এসে বিনীতা সঙ্কুচিত হয়ে বললে, 'আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল।'

হিমাদ্রি উৎসুকতার ভান করলে।

'আমি আজ গাড়িটা নিয়ে আসিনি, দয়া করে আমাকে যদি বাড়ি পৌঁছে দেন।'

হিমাদ্রি যন্ত্রচালিতের মতো গাড়ির দরজাটা খুলে দিলে।

পা-দানিতে পা রাখতে গিয়ে বিনীতা জিগগেস করলে : 'সঙ্গে আপনার ড্রাইভার নেই ?'

'না।'

'তবে আমি ওখানে একা বসব কী!' বিনীতা কাতর মুখ করে বললে, 'আপনার সঙ্গে আমার আরো যে অনেক কথা আছে।'

হিমাদ্রি অতএব তাকে পাশের সিটটা ছেড়ে দিল। কিন্তু, গাড়িতে স্টার্ট দিতেই তার সমস্ত শরীর অসংখ্যেয় স্নায়ুতন্ত্রীতে হাহাকার করে উঠেছে। অসহিষ্ণু, অসহায় গলায় বললে, 'আপনার বন্ধুকে একলা ফেলে রেখে চলে এলেন যে বড়ো ?'

বিনীতা উঠল খিলখিল করে হেসে : 'স্বয়ং ডাক্তারই যখন ছেড়ে আসতে পারলেন, আমি কোন ছার।'

গাড়িটা তবু নির্ভুল এগিয়ে চলল।

বিনীতা তার হাওয়ায়-ওড়া অসম্বৃত আঁচলে খসখস করে উঠল। বললে, 'আপনি আমার ওপর নিশ্চয়ই ভীষণ রাগ করেছেন। কিন্তু যতক্ষণ এই বন্ধ, গুমোট গলিটার মধ্যে। খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে এলেই

আপনার আর রাগ থাকবে না, কী বলেন! আমাকে তখন স্বচ্ছন্দে আপনি ক্ষমা করতে পারবেন।'

হিমাদ্রি অস্থির হয়ে বললে, 'আপনার বাড়ির ঠিকানা কী? কোন রাস্তা দিয়ে যেতে হবে?'

'বাড়িতে যেতেই হবে এমন কোনো কথা আছে নাকি?' বিনীতা অদ্ভুত ভাবে বললে।

'তবে?'

'এই যে দুঃস্বপ্নের মতো চাপা, বোবা একটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে পারলুম, এই খোলা হাওয়ায়, মুখর শহরের মধ্যে, এই তো অনেক।' বিচ্ছুরিত চঞ্চলতায় বিনীতা ঝলমল করে উঠল: 'শুধু নিজে বাঁচলুম নয়, আপনাকেও বাঁচিয়ে দিলুম, মিস্টার রায়।'

অভিভূতের মতো হিমাদ্রি বিনীতার মুখের দিকে তাকাল, সে-মুখে এতোটুকু সঙ্কোচ নেই, উজ্জ্বল নির্মলতায় তা মৃদু-মৃদু কাঁপছে। তার কথা বলা, তার হাসি, তার বসবার বিশ্রান্ত এই ভঙ্গি—সমস্ত

কিছু যেন বীতবর্ষণ আকাশে রৌদ্রের একটি ধারা। চৈত্রের চাঁদের মতো বিহ্বল, প্রগল্‌ভ একটি প্রাণের পূর্ণতা।

তবু, কৌশল করে ঠিকানা আদায় করে হিমাদ্রি তাকে শেষ পর্যন্ত বাড়িতেই পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। বিনীতা তাকে অনেক অনুরোধ করেছিল ভিতরে এসে বসতে, কিন্তু তার কোনো দরকার ছিল না।

কিন্তু আজ আর ভিতরে না গিয়ে উপায় নেই। কেননা সে আজ রুগী দেখতে এসেছে।

শুধু স্বাস্থ্যই যে মানুষের কত বড়ো রূপ এ-কথা জানতে হিমাদ্রির নিজেকে ছেড়ে বাইরের দিকে তাকাতে হয়নি, কিন্তু বলশালিতাও যে কত বড়ো একটা বিস্ময় তা তার প্রথম চোখে পড়েছিল বিনীতাকে দেখে, অণুভার বিছানার পাশে। দৃপ্ত, দৃঢ়, দীর্ঘ সে তার শরীর যেন একটা নিষ্ঠুর ঔজ্জ্বল্য —রূপ নয়, বিভা; কমনীয়তা নয়, শক্তি। দেখে মনে হয় আকাশের উপর দিয়ে বিশাল পাখায় উড়ে চলেছে একটা ঈগল, এমনি তার দুর্বারতা।

দ্রাঘিমার সঙ্গে এতখানি আয়তন বাঙালি মেয়েদের দেখা যায় না, অথচ শরীরে, মেদের বিস্ফার নেই, পেশীর কাঠিন্য। সমস্তটি আবির্ভাব তার মহীয়ান। প্রাণের প্রাচুর্যে যেন সে উচ্ছ্রিত হয়ে পড়ছে। জানলা ঘেঁষে তক্তপোশটা সরিয়ে আনা দরকার, হিমাদ্রি একটা চাকর-বাকরের সাহায্য চাচ্ছিল, হাসতে-হাসতে বিনীতা এসে হাত দিল। স্ক্রু দিয়ে কডলিভারের কর্কটা শত টানাটানি করেও খোলা যাচ্ছে না, অথচ দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা সামান্য না কামড়েই বিনীতা এক টানে সেটা খুলে ফেলল। তার আঙুলগুলি ফুলের পাপড়ি নয়, আগুনের শিখা, চঞ্চলতায় নয়, তেজে, জোর করে ছিনিয়ে নেবার উদ্দামতায়। সে বেঁচে আছে, সমস্ত জীবনে তার সেই নির্মম ঘোষণা, ভঙ্গিতে তেমনি একটা প্রবল প্রাখর্য। বাঁচা ছাড়া আর তার কোনো বড়ো কাজ নেই, প্রচুর প্রতপ্ত বাঁচা। তার জন্যে যতটুকু জোর, যতটুকু নির্লজ্জতা—কিছুই একতিল সে ছাড়বে না।

প্রথম যেদিন বিনীতার সঙ্গে তার আলাপ হয়, অণুভার রোগা, মুখভার-করা মেঘলা সেই ঘরে, হিমাদ্রির মনে হয়েছিল যেন বহুদিনের গুমোট কেটে দুর্দান্ত একটা ঝড় এসেছে, জলহীন শুকনো খানিকটা উচ্ছৃঙ্খল হাওয়া। কী প্রগল্‌ভ হাসি, কী প্রাণ-খোলা কথা—এটা যে রুগীর ঘর তাতে তার খেয়াল নেই, সে যে বরং রুগীর ঘরে এসেও বেঁচে আছে এটাই আগে জানানো দরকার। রুগীর ঘরের আবহাওয়ার সঙ্গে কখনো সে নিজের স্বর নামিয়ে আনেনি : ঘরের মধ্যেও তার বাইরের উন্মুক্ততা। পৃথিবীতে কার কী হয়েছে তাতে তার কী এসে যায়, শুধু সে যে এখনো সশরীর বেঁচে আছে, জ্বলন্ত উচ্ছলতায়, এই তার যথেষ্ট উদ্‌ঘাটন।

অটল, অটুট সেই শরীরে কোথাও রোগের একটা রেখা পড়তে পারে, হিমাদ্রির কাছে তা বিচিত্র মনে হচ্ছিল।

ড্রয়িং-রুম পেরিয়ে ছোট আরেকটা ঘরের নির্জনতায় নিয়ে এসে বিনীতা বললে, ‘বসুন।’

বিনীতার শুধু স্বাস্থ্যই নয়, সমৃদ্ধিও দেখতে হবে।

নিচু একটা কৌচে বসে পড়ে হিমাদ্রি যান্ত্রিক গলায় জিগগেস করলে : 'কী হয়েছে ?'

'আমাকেই বলতে হবে ?' বিনীতা হাসির একটি মৃদু নিঃশব্দ ঢেউ তুলে পাশের আরেকটা সোফাতে গিয়ে বসল : 'আপনি নিজে যদি না পরীক্ষা করে বুঝতে পারেন, তবে কি ছাই আপনি এত বড়ো ডাক্তার হয়েছেন !'

'কিন্তু একটা ওয়ার্কিং হাইপথেসিস তো চাই—কোনদিক দিয়ে অগ্রসর হতে হবে।' হিমাদ্রি তীক্ষ্ণ চোখে বিনীতাকে একবার লক্ষ্য করল : 'অন্তত লক্ষণ দু-একটা বলুন।'

'লক্ষণ ?' বিনীতা খিলখিল করে হেসে উঠল : 'দাঁড়ান, ভেবে দেখি।'

হিমাদ্রি সজাগ হয়ে উঠল। কুণ্ঠিতমুখে বললে, 'আপনার কিছু অসুখ করেনি।'

'অসুখ করেনি ?' বিনীতা আহত বিস্ময়ের ভঙ্গি করলে : 'অসুখ না করলে আমাদের চলবে কেন ?

অসুখ না হলে কি আমরা কখনো আপনার মতো বহুদর্শী ডাক্তারের মনোযোগ পেতে পারি ?'

'কিন্তু কী হয়েছে তাই বলুন না ?'

'এই কাল রাতে কিছু ঘুমুতে পারিনি, চাপা একটা সর্দির ভাব, গা-টা ম্যাজ-ম্যাজ করছে, মাথাটা ধরা—'

বিনীতা ফিক করে হেসে ফেলল।

'এই ?' হিমাদ্রি নিষ্প্রাণ গলায় বললে।

'কেন এগুলি কি আর অসুখ নয় ? এ হয়ে, কিছু না হয়েও কি লোকে মরে যেতে পারে না ?'

'আপনি পারেন না, অন্তত আপনার চেহারায় তার কোনো আভাস নেই।'

'নেই ? দেখুন, ভালো করে নাড়ীটা একবার দেখুন।' বিনীতা বিসর্পিত লীলায় ডান হাতখানি হিমাদ্রির দিকে বাড়িয়ে দিল।

হিমাদ্রি কোনোরকম কৌতূহল দেখাল না ; বললে, 'আমি এতটা বহুদর্শী হয়েছি যে রোগ নির্ণয় করতে আমার আর নাড়ী টিপতে হয় না।'

‘আপনি বুঝতে পেরেছেন আমার কী অসুখ?’ বিনীতা রূঢ় ভঙ্গিতে উঠে বসল।

হিমাদ্রি প্রশান্ত মুখে বললে, ‘অসুখ বুঝতে দেরি হলেও, অসুখ না হলে তা বুঝতে কখনো দেরি হয় না।’

‘ও। আপনি এমন ডাক্তার! বিছানায় লম্বা হয়ে না শুলে বুঝি কারুর অসুখ করে না?’ বিনীতা চাপা রাগে প্রচ্ছন্ন ঠাট্টা করলে: ‘আমি যদি সুস্থ-ও থাকি আপনি মনে করেন, তবে, এই যে কাল থেকে আমার অসুখ হয়েছে অসুখ হয়েছে একটা ভাব হয়েছে সেই তো আমার অসুখ হওয়া।’

‘কিন্তু আমি তো আর মনের চিকিৎসক নই।’

‘বেশ তো, ভালো কথা। মন না বোঝেন, অন্তত হার্ট, ব্লাড-প্রেসারটাও তো একবার দেখতে পারেন।’ বিনীতার গলা আচ্ছন্ন হয়ে এল: ‘এখুনি যে আমি হার্ট-ফেল করে মরে যেতে পারি না তার কী নিশ্চয়তা আছে?’

‘নিতান্তই যদি সেই উদ্যোগ করেন, তখন তার

ব্যবস্থা করা যাবে।' হিমাদ্রি ব্যস্ত, কিছু-বা বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল ; স্নিগ্ধ মুখে বললে, 'কিছু হয়নি, দিব্যি সুস্থ, নীরোগ আছেন, মিছিমিছি একটুতেই কেন যে আপনারা ডাক্তার ডাকেন—'

'সুস্থ আছি !' বিনীতাও উঠে দাঁড়াল : 'থাকলুমই বা না-হয় সুস্থ ! আপনার কাছে সুস্থ শরীরের বুঝি কিছু দাম নেই, সুস্থ লোকের সঙ্গ বুঝি আপনার ভালো লাগে না। হতুম পোকায়-খাওয়া ঝাঁজরা একটা দেহ, পালক-ওঠা মরা একটা পাখির ছানার মতো, তাহলেই বুঝি আমার পাশে দু দণ্ড আপনি বসতেন, তা হলেই বুঝি আপনার কাছে আমি মূল্যবান হয়ে উঠতুম। আমি ভালো আছি, এটা আর আপনার কাছে কোনো আকর্ষণ নয়।'

হিমাদ্রি পাথরের মতো ঠাণ্ডা, অনড় দাঁড়িয়ে রইল।

'কিন্তু মিছিমিছি ডেকেছি আপনাকে কে বললে ?' বিনীতার দু চোখ বিদ্রূপে ঝকঝক করে উঠল : 'আমি তো আর আপনাকে বিনা ফি-তে ডাকিনি।'

বিনীতা টেবিলের উপর তার হাত-ব্যাগের দিকে এগিয়ে এল : 'ন্যায্য ফি তো আমি দিতুমই।'

'তা দেবেন তো বটেই।' হিমাদ্রি নির্লজ্জের মতো বললে, 'নইলে আমাদের ব্যবসা চলে কি করে?'

'ব্যবসা!' কথাটা যেন নতুন শুনছে বিনীতা এমনি একখানা মুখ করল। ব্যাগের থেকে কতগুলি টাকা বার করে বিনীতা মরিয়ার মতো বললে, 'হ্যাঁ, আপনার সে-সম্মান আমি রাখব। কিন্তু পুরো ফি পেলেও কি আপনি একটু বসবেন না, দেখবেন না রুগীকে?'

হিমাদ্রি এতটুকুও টলল না, সহজ দরাজ গলায় বললে, 'আপনাকে কিছুই দেখবার নেই।'

'কেননা আমার যক্ষ্মা হয়নি,' বিনীতা জ্বলে, ঝাঁজিয়ে উঠল : 'কেননা আমি কেশে-কেশে শরীর পাত করছি না।'

'যদি বলতে অনুমতি দেন তো বলি,' হিমাদ্রি শান্ত মুখে বললে, 'এই সব রুগ্ন, ভগ্ন, মুমূর্ষ শরীরের উপরেই ডাক্তারের আকর্ষণ। দিন,' হিমাদ্রি তার

ফি-টার জন্যে নিঃসন্দেহ হাত বাড়াল : 'আমাকে এখুনি যেতে হবে।'

'তা জানি।' হাতটা এবার এগিয়ে দিতে বিনীতার কিছুমাত্র চেষ্টা দেখা গেল না, আহত গলায় বললে, 'কিন্তু আপনাকে ডাক্তার হিসেবেই ডেকেছি, তা তো না-ও হতে পারে।'

'না, আর হয় না। দিন, আমার সময় নেই।'

'কিন্তু এত দিন তো অঢেল সময় ছিল।' বিনীতা ভ্রূকুটি করল: 'এত দিন তো একটা তুচ্ছ, ঘৃণ্য রুগীর পাশে বসে বাকি জীবন অনায়াসে কাটিয়ে দিচ্ছিলেন। পোকায়-খাওয়া কালো একটা দাঁতের চেয়ে যা কুৎসিত। কই, তখন তো কোনোদিন সময়ের দাম আছে বলে কোনো উপদেশ শুনিনি।'

'হ্যাঁ, দেখুন, অনর্থক তর্কে আমি কোনোদিন পটু নই।' হিমাদ্রি উসখুস করে উঠল।

ভিজিটের টাকা কটা বিনীতা গুনে-গুনে তাকে এগিয়ে দিল।

টাকা কটা পকেটে ফেলে হিমাদ্রি তারপর বেরিয়ে

যাচ্ছে, পিছন থেকে বিনীতা অসহায় একটা কান্নার মতো করে বললে: 'সটান চলে যাচ্ছেন কী? আমার একটা ব্যবস্থা করে গেলেন না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' যেন কথাটা এতক্ষণে মনে পড়েছে এমনি সন্ত্রস্ত একটা লজ্জার ভাব করে হিমাদ্রি ফিরে দাঁড়াল: 'কি না জানি বললেন? সর্দি, মাথা ধরা, জ্বর-জ্বর ভাব—তা স্ট্রং একটা য়্যাস্পিরিন নিলেই সেরে যাবে। নমস্কার, আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই।'

দ্রুত একটা দীর্ঘশ্বাসের মতো হিমাদ্রি মোটর ছুটিয়ে দিলে।

এ সে করেছে কী! মৃত্যুর মুখাপেক্ষী, দুর্বল, শিশুর মতো অসহায় একটা রুগীর উপর কিনা সে এতক্ষণ রাগ করে ছিল। দীর্ঘ দিন একঘেয়ে রোগে ভুগে রুগী যদি না প্রলাপ বকে, তবে প্রলাপ বকবার অধিকার কী রয়েছে বিনীতার, সুস্থ, সবল, উদ্ধত বিনীতার? ভালো করবার মহান প্রতিজ্ঞা নিয়ে সে কিনা এক কথায় সব ভুলে গেল? যার কেউ নেই, তাকে সামান্য একটা কথা দিয়ে সে তা রাখতে পারল না? এত সহজেই সে স্বীকার

করল হার, মনের সামান্য একটা অভিমানের কাছে! এমন একটা মহান দায়িত্বের চেয়ে তুচ্ছ একটা ভাবাবেগ কিনা তার কাছে বড় হল! কে তাকে কী বলেছে, কিন্তু তা যে কেন, কী অবস্থায় তাকে তা বলতে পারল, তা সে একবার ভেবে দেখল না। তার কথাটাই তার কাছে বেশি হল, আসন্ন তার এই স্তব্ধতাটা নয়। অথচ তখনো আশা ছিল, তখনো সে শ্বাস নিচ্ছে।

হিমাদ্রি তির্যক, বিপজ্জনক একটা বাঁক নিলে।

গলিটা যেন ভীষণ স্তব্ধ, তার মনে হল। যেন বেশি লোকজন চলছে না, গাড়ি-ঘোড়াগুলো ঘুর পথে ঘুরে যাচ্ছে। ফিরিওয়ালা এ-গলির কথা ভুলে গেছে, যেন এ-গলিতে কেউ কেনবার নেই। কেবল কটা কাক কণ্ঠ বিদীর্ণ করে চীৎকার করছে। তাতে স্তব্ধতাটা আরো যেন কেমন স্থূল, কেমন সশঙ্ক।

গাড়িটা এত শব্দ না করলেই যেন পারত।

নিচেটা ফাঁকা, যে যার ঘরে গিয়ে দরজা দিয়েছে। পায়ে-পায়ে স্তব্ধতা ঠেলে-ঠেলে হিমাদ্রি এগোতে

লাগল। এই সিঁড়ি, উপরে উঠে যাবার ইশারা করছে। একেক করে হিমাদ্রি সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। কিন্তু কোথায় যে সে চলেছে তা কে জানে ?

এমন সময়, আধ-পথে, পরিচিত গলায় কে যেন শুকনো, খনখনে একটা কাশির আওয়াজ করল।

সংসারে এমন একটা মিষ্টি আওয়াজ সে কোনো-দিন শুনেছে কিনা হিমাদ্রি ভেবে পেল না। আগে যেটুকু বা সে টিপে-টিপে আসছিল, এখন এক লাফে দু-তিন সিঁড়ি সে অনায়াসে ডিঙিয়ে গেল।

নিরাভরণ, রিক্ত একটা ঘর। চারদিকে কেমন একটা বাসি, ঘর-ছাড়া চেহারা। যেন কালকের রাতটা এ-ঘর থেকে এখনো সম্পূর্ণ কাটেনি।

প্রচ্ছন্ন আবির্ভাবের আশায় অণুভা ভোর-রাত্রের অন্ধকারের মতো আলোড়িত হয়ে উঠল।

বললে, 'কে ?'

হিমাদ্রি সামনে এসে দাঁড়াল, প্রত্যক্ষ, প্রখর, প্রায় ঈশ্বরের মতো। তাকে ধরা যায় এমন আশ্চর্য স্পষ্ট, তার বিস্তীর্যমান উপস্থিতির তাপ এসে গায়ে লাগছে

এমন সে কাছে। তবু অণুভা নিমেষে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বিরক্ত গলায় বলতে চেষ্টা করল : 'আপনি আবার এসেছেন?'

'হ্যাঁ, এসেছি। আর, এবার আপনাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি।'

কারুর বসবার জন্যে চেয়ারটাও আর কাছাকাছি রাখা হয়নি। হিমাদ্রি বিছানার উপরেই বসে পড়ল।

অণুভার সমস্ত মুখ সূর্যাস্তরাগের মতো জ্বলে উঠেছে : 'নিয়ে যেতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ, দেখলেন তো, মৃত্যু কিছুতেই এল না। তাকে এক রাত জায়গা পর্যন্ত ছেড়ে দিলুম, তবুও সে এল না, আসবে না সে।' হিমাদ্রি তার রিক্ত, উৎসুক একখানা হাত নিজের বলিষ্ঠ স্পর্শের আশ্রয়ে টেনে নিল : 'শেষ পর্যন্ত আমি, আমিই এলুম আপনাকে নিয়ে যেতে।'

অণুভার সমস্ত শরীর বাঁশির সুরের মতো ধ্বনিত হয়ে উঠল : 'কোথায়?'

'আর-কোথাও।' হিমাদ্রি তার গলায় যেন কোনো ভাষা পাচ্ছে না।

'তবু জায়গা তো কোথাও একটা আছে।' অণুভা তার বিশাল দুটি চক্ষু হিমাদ্রির মুখের দিকে তুলে ধরল।

'অনেক, অনেক জায়গা পৃথিবীতে।'

'নাম বলুন।'

'আপাততো আপনাকে আমি কোনো সমুদ্রে নিয়ে যাব।'

'সমুদ্র ?' অণুভা যেন আনন্দে কেঁদে উঠল।

'নীল, বিশাল উন্মুক্ততায়। মানুষ এতদিন ধরে কী করতে পারল পৃথিবীতে ? উলঙ্গ মাটির ওপর উলঙ্গ কতগুলি দেয়াল তুলল শুধু। যেখানে দেয়াল নেই, অন্তরাল নেই, অবকাশ নেই—সেই একটা বিস্তীর্ণ মুক্তির আকাশে।'

'আপনি স্বপ্ন দেখছেন।'

'হ্যাঁ, স্বপ্নই তো দেখছি।' হিমাদ্রি নির্বাষ্প, নির্ভীক গলায় বললে, 'এত দিন বহু বাস্তবতার সঙ্গে সংগ্রাম

করলুম, নির্দয়, নিরর্থক বাস্তবতা—এবার স্বপ্ন, সত্যি করে এবার আমাকে স্বপ্নই দেখতে দিন।'

অণুভার তবু যেন কোথায় বাধা লাগছে। স্নিগ্ধ, অথচ সন্দিগ্ধ গলায় সে জিগগেস করলে: 'কিন্তু কেন, কেন আমাকে নিয়ে যেতে চান?'

'কেন? আপনাকে আমি ভালো করব, এখনো ভালো করব। আপনাকে ভালো করব বলে আমি কথা দিয়েছি।'

'কথা দিয়েছেন? কার কাছে?'

'ঈশ্বর মানি না, তবু ঈশ্বরের কাছে।'

শান্ত, গভীর অবসাদে অণুভার চোখ বুজে এল। ক্লান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'কিন্তু এই শুধু দুঃখ, আপনার সমস্ত স্বপ্ন একদিন ভেঙে যাবে।'

'ভাঙবে না, আপনি যদি আমার মুঠো থেকে আপনার এই হাত না কখনো সরিয়ে নেন। বলুন, আপনি বেঁচে উঠতে চান।'

'ভীষণ বেঁচে উঠতে চাই।' অণুভা তার শীর্ণ হাতের সমস্ত কাকুতি দিয়ে হিমাদ্রিকে আঁকড়ে

ধরল, সর্বাঙ্গ থেকে তার আত্মা উঠল যেন অন্ধ আর্তনাদ করে : 'আমাকে বাঁচান, যদি পারেন এখনো আমাকে বাঁচান।'

'আর ভয় নেই, এবার আপনাকে বাঁচাব।' আরেক হাতে হিমাদ্রি তার কপালে, চুলে, গালের পাশটিতে আস্তে-আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

'আঃ, সমুদ্র থেকে গায়ে আমার এখন হাওয়া দিচ্ছে।'

'আপনি যাবেন, যাবেন তো ঠিক?' হিমাদ্রি যেন এখনো নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

'যাব না?' অণুভা হেসে উঠল : 'বা রে, যাবার জন্যে আমি তো কতদিন থেকেই তৈরি হয়ে বসে আছি। কেউ আমাকে এসে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, দেয়ালের বাধা সরিয়ে, শাদা, অবিনশ্বরতার মতো শাদা, অবাধ সমুদ্রে। কিন্তু,' অণুভা হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল : 'বাবাকে তো বলতে হয়।'

'হ্যাঁ, উনি অফিস থেকে ফিরুন, বলতে হবে বৈকি।'

'কিন্তু উনি যদি বাধা দেন ?'

'কেন দেবেন ? আমি ওঁকে সব বুঝিয়ে বলব ; বলব, চেঞ্জে না গেলে ভালো হবার আর আশা নেই। আর উনি যখন আমার হাতে আপনার সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই কোনো আপত্তি করবেন না।'

'সমস্ত ভার ! কবে আমরা যাব ?'

'কালকের দিনটা গোছগাছ করতে লাগবে—পশু´।'

'আমার তো কিছুই নেবার নেই, না ?'

'না, সব আমি নেব।'

'উঃ, পশু´। সে কবে ?' অণুভা হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল : 'আমি যেতে পারব তো ?'

'খুব পারবেন। আমিই আপনাকে লং-চেয়ারে করে আস্তে-আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে নেব, তারপর রাস্তায় গাড়ি থাকবে, গাড়ির মধ্যে হাসপাতাল—ভাবনা কী !'

অণুভা ছেলেমানুষের মতো তরল খুশিতে উথলে উঠল : 'ও ! আপনিই তো সঙ্গে থাকবেন। আশ্চর্য,

সেই কথাটাই আমার এতক্ষণ মনে ছিল না। আর সেখানে তো আপনাকে দিনে-রাতে আমার কাছেই থাকতে হবে, নয়? সেখানে তো আর বেশি লোক নিয়ে যাওয়া চলবে না।'

'না। শুধু রুগী আর ডাক্তার।'

'এমনিতেই যখন আপনি একটু কাছে থাকেন, কত ভালো থাকি; আর এ যদি সত্যি হয়,' পাছে সত্যি না হয় অণুভা ভয়ে-ভয়ে চোখ বুজল: 'আপনি সব সময়ে আমার সঙ্গে আছেন, আমাকে ছেড়ে যাননি, তা হলে আমি তো নিশ্চয় ভালো হয়ে যাব।'

কথাটা শেষ করবার উত্তেজনায় অণুভা আবার চোখ মেলল।

'আর আপনি সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেলেও আমি আপনাকে ছাড়ব না।'

গাঢ় আবেশে চোখের পাতা দুটি নামিয়ে আনতে-আনতে অণুভা বললে, 'আমার এখন ভারি ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।'

'বেশ তো, ঘুমুন না। আমি ততক্ষণ বনমালী-বাবুর জন্যে অপেক্ষা করি।'

'ঘুমুতে ইচ্ছে হচ্ছে কেননা ঘুম ভেঙে আপনাকে ফের আমার পাশে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে বলে।'

হিমাদ্রি চুপ করে ঠায় বসে রইল।

বনমালীবাবুর ফিরতে-ফিরতে প্রায় সন্ধে। বারান্দায় উঠে আসতেই হিমাদ্রির সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল।

'এই যে, তুমি এসেছ দেখছি।' বনমালীবাবুর গলাটা বিশেষ প্রসন্ন নয় : 'কাল রাতে ওর অবস্থাটা খুব খারাপ গেছলো। একটুও ঘুমুতে পারেনি।'

'আজ এখন তো বেশ ভালো আছে। খানিক আগে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে উঠল।' হিমাদ্রি একটা ঢোঁক গিলল : 'কাল খারাপ গেছলো তো আমাকে খবর দেননি কেন ?'

'তোমাকে খবর দেব কী ?' বনমালীবাবু ঈশৎ তপ্ত গলায় বললেন, 'শুনলুম, অণু বললে, তুমি নাকি এখানে এতদিন ধরে এক কানাকড়িও ফি পাওনি

বলে, ওকে বকে শাসিয়েছ মেজাজ দেখিয়ে চলে গেছ। সামান্য একটা নার্স ছিল, তাকে নাকি ভাঙা রাতটার জন্যেও থাকতে দাওনি। দামী ও অদামী যা যেখানে ওষুধ-পত্র ছিল, টিপাই-সুদ্ধু সমস্ত শিশি-বোতল নাকি তুমি ভেঙে ছত্রখান করে দিয়েছ।'

হিমাদ্রি অপরিমিত হেসে উঠল। বললে, 'হ্যাঁ, ও-সব আমি সমস্ত ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দিয়েছি, কেননা ও-সবে কিছু আর কাজ হবে না।'

'ও-সবে কাজ হবে না, তবে কিসে হবে?'

'ওকে এখন একবার চেঞ্জে নিয়ে যাওয়া দরকার।'

'কোথায়?' বনমালীবাবুর চোয়ালটা তেরছা হয়ে গেল।

'ভাবছি, আপাততো গোপালপুর, সেখানে না হলে ভাওয়ালি, দরকার হলে ইউরোপেও যেতে হতে পারে।'

'ইউরোপ!' বনমালীবাবু আঁতকে উঠলেন: 'তুমি বল কী, হিমাদ্রি! শেষকালে ইউরোপ যেতে হবে!'

'কী আর করা!' হিমাদ্রি সহজ, নির্লিপ্ত গলায়

বললে, 'অসুখ যখন হয়েছে, যে করে হোক, ভালো করা তো চাই। এমনিতে তো আর ছেড়ে দিতে পারি না।'

'কী যে বলছ আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।' হাঁটতে-হাঁটতে বারান্দার প্রান্তে ছেলেদের সেই পড়ার ঘরটুকুতে হিমাদ্রিকে বনমালীবাবু নিয়ে এলেন: 'মানুষ আজকাল উড়ে বিলেত যাচ্ছে জানি কিন্তু কত রাজ্যের তাতে তেল পোড়ে তার খবর রাখ?'

'হ্যাঁ, তারপর, এমন একটা রুগীর পরিচর্যা!' যেন গায়ে লাগছে না এমনি নিটোল গলায় হিমাদ্রি বললে, 'খরচের তো অন্ত-ই নেই বলতে গেলে। আগুনের মতো খরচ! কিন্তু এখুনিই তো আর ইউরোপ যাওয়া হচ্ছে না। আগে ভারতবর্ষের দু-একটা সমুদ্র-তীর ঘুরে দেখা যাক। গোপালপুরটা মন্দ নয়।'

কিন্তু সেখানেও তো আর পদব্রজে যাওয়া চলবে না।' বনমালীবাবু রুখে এলেন: 'এত সব খরচ কে দেবে শুনি?'

'যে এতদিন ধরে দিয়ে আসছিল—আমিই দেব।' হিমাদ্রি অসহিষ্ণু গলায় বললে, 'সামান্য টাকা খরচ হবে বলে চিকিৎসা তো আর বন্ধ করে রাখা যায় না। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে তো দেখতে হবে।'

টাকার ইশারাটা বনমালীবাবুকে নির্মম খোঁচা মারল, কিন্তু তিনি কণ্ঠস্বরকে সংযত করাই যুক্তি-যুক্ত বিবেচনা করলেন ; বললেন, 'কিন্তু কোন স্বার্থে এতগুলি টাকা তুমি ব্যয় করতে যাবে ?'

'স্বার্থ, স্বার্থ আবার কী ! একটা লোক চোখের সামনে ধুঁকে-ধুঁকে মরছে, পৃথিবীতে করবার যার এত কাজ, বাঁচবার যার এত আগ্রহ—যাকে ভালো করবার ভার হাতে নিয়েছি, তাকে বাঁচিয়ে তোলবার চেষ্টা করছি—এর চেয়ে আর বড়ো স্বার্থ বলুন মানুষের কী হতে পারে ? টাকা—টাকা তো শুধু ব্যয় করবার জন্যেই তৈরি হয়েছে।'

উত্তরটা বনমালীবাবুর মনঃপূত হল না, বললেন, 'কিন্তু অপব্যয় করবার জন্যে নিশ্চয়ই নয়।'

'টাকাটা যখন সত্যি-সত্যি খরচ হয়ে যায়, এমন

মজা,' হিমাদ্রি হেসে ফেলল : 'যত ভালো কাজেই তা খরচ করুন না কেন, সব সময়েই সেটাকে একটা প্রকাণ্ড অপব্যয় বলে মনে হবে।'

'আচ্ছা, টাকা না হয় হল, অনেক রকম খেয়ালে বড়োলোকেরা টাকা উড়িয়ে থাকে,' বনমালীবাবু সন্দিগ্ধ গলায় বললেন, 'কিন্তু গোপালপুর, গোপালপুরই বা ওর সঙ্গে কে যাবে শুনি ? এমন কে আছে যে সমস্ত কাজ-কর্ম ফেলে রুগী আগলে বসে থাকবে ?'

'আমি কাউকেও তো তেমন দেখতে পাচ্ছি না। এই অবস্থায়,' হিমাদ্রি এতটুকুও সঙ্কোচ করল না : 'আমি, আমিই যাব আর কি।'

'তুমি ?'

'কাজে-কাজেই। এখন যা ওর অবস্থা, সঙ্গে সমস্ত সময় একজন ডাক্তার দরকার।'

বনমালীবাবু যেন ফাঁপরে পড়লেন। হাঁপ নিয়ে বললেন, 'তুমি এ কী বলছ, হিমাদ্রি ? তুমি নিয়ে যাবে কী ওকে ? তোমার প্র্যাকটিস নেই ?'

'প্র্যাকটিস ? দু-একবছর প্র্যাকটিস না-হয় না-ই করলুম।' হিমাদ্রি অল্প একটু হাসল : 'আর দেখছেন, এও তো একরকম প্র্যাকটিস।'

বনমালীবাবু কথাটার উপর যেন প্রবল একটা ধিক্কার দিয়ে উঠলেন : 'তুমি পাগল হয়েছ নাকি, হিমাদ্রি ?'

'পাগল ?' হিমাদ্রি অবাক হয়ে গেল : 'এতে পাগলামির আপনি কী দেখলেন ?'

'পাগলামি নয় ? একটা রুগী কাঁধে করে দেশে-দেশে ঘুরে বেড়ানোটা সুস্থতা ?'

'একদম মরে গেলে তাকে বয়ে বেড়ানোর চেয়ে এতেই তো বরং কিছু সুস্থতা আছে বলে আমার মনে হচ্ছে।' হিমাদ্রি হেসে উঠল।

'এ অসম্ভব।' বনমালীবাবু চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

'কী অসম্ভব ?'

'অণুকে তোমার কোনোখানে নিয়ে যাওয়া চলবে না।'

হিমাদ্রি একমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল।

অথচ এমন একদিন ছিল যেদিন এর সম্ভাব্যতাটা ছিল প্রায় মৃত্যুর মতোই প্রতিপাদিত। হিমাদ্রি ইচ্ছে করলেই সেদিন অনায়াসে, প্রায় একটা আঙুলের ইশারায় অণুভাকে আপনার করে নিতে পারত, তাতে কোথাও এতটুকু বাধা ছিল না, এতটুকু কারু অসুখ করত না কোথাও। সেদিন, হিমাদ্রি অনেক দূর পিছনে চেয়ে দেখল, সেখানেই তো আছে থেমে, ঘটনার চাকা টলে যায়নি সুমুখে।

বলতে পার সেদিনকার মতো অণুভার জীবনে সে-সময় আর এখন নেই, কিন্তু এ-ও তো বলতে পার, তার সে-দিনকার সেই জীবনে এই বিরলতম মুহূর্তটিও ছিল না। অণুভাকে হিমাদ্রি একবার জিগগেস করে দেখবে : 'মানুষ কি সময়ে বাঁচে, না-মুহূর্তে ?'

প্রচ্ছন্ন দৃঢ়তার সঙ্গে হিমাদ্রি বললে, 'তবে আপনি ওকে এই আলো-বাতাসহীন বন্ধ ঘরের মধ্যে তিল-তিল করে মেরে ফেলতে চান ?'

'অদৃষ্টে যদি ওর তাই থাকে তবে তা কে খণ্ডাতে পারবে?' বনমালীবাবু দার্শনিকের মতো মুখ করে বললেন, 'গরিবের ঘরের মেয়েরা বাড়ির মধ্যেই মরে থাকে।'

'কিন্তু, গরিব, গরিব ওকে আর কী করে বলতে পারেন? আমিই তো সমস্ত টাকা দিচ্ছি।'

'তুমি টাকা দিচ্ছ বলেই তো আর ওর সপ্তপুরুষ উদ্ধার হয়ে যাচ্ছে না।' বনমালীবাবুর সমস্ত মুখ গুমোট হয়ে উঠল। ঘোলাটে গলায় বললেন, 'এ-সব বাজে খেয়াল রাখ—এ কখনো হতে পারে না।'

'কিন্তু এ যে হতেই হবে।' হিমাদ্রিও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল : 'নইলে, আর কোথাও না গেলে যে ও কিছুতেই ভালো হবে না।'

'না হোক।' বনমালীবাবু নিষ্ঠুর একটা উক্তি করলেন : 'তেমনি, শোনা গেছে, পরলোকে গিয়েও লোকে ভালো হয়।'

'আপনি বাপ হয়ে—'

'আর তুমিই বা একটা অনাত্মীয় ডাক্তার হয়ে এমন

অসম্ভব মায়া দেখাচ্ছ কেন?' বনমালীবাবু ঝাঁজিয়ে উঠলেন: 'সব কিছুরই একটা সীমা আছে। যাও, বেশি টাকা থাকে, একটা হাসপাতাল খুলে দাও গে যাও, যথেষ্ট হয়েছে, এখানে এসে আর তোমাকে অনর্থক জাঁক করতে হবে না।'

'কিন্তু এখন যাও বললেই বা আমি যাই কি করে? আমি ওকে ভালো করবার সম্পূর্ণ ভার নিয়েছি।'

'তাই বলে তুমি ভাবছ, একা, রোগা আমার মেয়েকে নিয়ে তোমাকে আমি দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াতে দেব?' বনমালীবাবু মুহূর্তে আগুন হয়ে উঠলেন।

পৃথিবীতে কিছুই যেন এতে হতে পারে না, বরং এই যেন একান্ত সঙ্ঘটনীয় এমনি একখানা প্রশান্ত মুখ করে হিমাদ্রি বললে, 'হ্যাঁ, দিতে হলে একমাত্র আমার সঙ্গেই তো দেওয়া উচিত।'

'তোমার সঙ্গে দেওয়া উচিত!' বনমালীবাবু বিজ্ঞের মতো বললেন, 'তুমি ভেবেছ কি ও মরতে বসেছে বলেই ওর আর কোনো সম্মান নেই, মর্যাদা নেই?

ও দুর্বল বলেই তুমি যথেচ্ছ অত্যাচার করতে পারবে ?'

উদ্গত হাসিটা হিমাদ্রি পিষে ফেলল ; বললে, 'তা আমার চেয়ে আপনি কি বেশি জানেন ? উনি যে মরতে বসেছেন তাতেই তো ওঁর বেশি সম্মান, বেশি মর্যাদা। ওঁর দুর্বলতাই তো ওঁর শক্তি।'

'তাই বলে যুবতী মেয়েকে আমি তোমার সঙ্গে হাওয়া খেতে দেব ?' বনমালীবাবু এবার কণ্ঠস্বরে অনাবৃত হয়ে দাঁড়ালেন : 'বাপ হয়ে তাই আমাকে তুমি করতে বলবে আর এ কেলেঙ্কারিকে আমি প্রশ্রয় দেব ভেবেছ ?'

হিমাদ্রি চেঁচিয়ে হেসে উঠবে কিনা ভাবলে।

'কিন্তু,' হিমাদ্রি স্পষ্ট করে বললে, 'কিন্তু অকাল-মৃত্যুর চেয়ে মানুষের আর কী বেশি কলঙ্ক হতে পারে বলুন। একটা পোকায়-খাওয়া পঙ্কিল দেহ—এ যদি না ওর কলঙ্ক হয়, তবে তার চেয়ে আর বড়ো পাপ, বড়ো অশুচিতা তো আমি কল্পনা করতে পারি না।'

'করতে বলিওনা তোমাকে। দয়া করে এখন তুমি যাও।' বনমালীবাবু যেন শেষ কথা বললেন: 'আমার মেয়ে, আমার যা ইচ্ছে তাই ব্যবস্থা করব। মরুক বা বাঁচুক, তাতে তোমার কী?'

হিমাদ্রি অল্প একটু হাসল; বললে, 'আপনার মেয়ে তা আমি জানি; কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা ছিল—আমার রুগী।'

'তোমার রুগী!' রাগে বনমালীবাবুর ভুরু দুটো কাঁপতে লাগল: 'কে তোমাকে এসে এখানে বিনি-পয়সায় কর্তৃত্ব ফলাতে বলছে? এই তো তোমার ডাক্তারির ছিরি, দাঁড়ানো মেয়েটাকে শুইয়ে ছেড়েছ। কাল থেকে তুমি আর এ-বাড়ি আসবে না বলে দিচ্ছি, কাল থেকে ওর হোমিওপ্যাথি করাব।' বলে ফুলতে-ফুলতে বনমালীবাবু তাঁর ঘরের মধ্যে অন্তর্হিত হলেন।

হিমাদ্রি অন্যমনস্কের মতো বারান্দায় খানিক পাইচারি করে আস্তে-আস্তে অণুভার নির্বাসিত ঘরে এসে ঢুকল।

ঘরে এসেই দেখে, অণুভার অন্যরকম চেহারা। কৃশ, প্রখর একটা ভঙ্গি করে বিছানায় আধখানা সে উঠে বসেছে, সমস্ত শরীর উত্তেজনায় এখুনি যেন ছিঁড়ে পড়বে।

হিমাদ্রিকে ঘরে ঢুকতে দেখেই অণুভা বালিশের উপর ভেঙে পড়ল, আর দুই হাতে মুখ ঢেকে সে তার কী কান্না! বললে, 'কেন আপনি আমার জন্যে এমন অপমানিত হলেন—আমি আপনার কে?'

'সে-কথা আর একশোবার করে জিগগেস কোরো না,' হিমাদ্রি তার মুখের থেকে আবদ্ধ দুই হাত আস্তে-আস্তে বিচ্ছিন্ন করে নিল; ঘরের ম্লান-হয়ে-আসা ক্ষীণায়ু আলোয় তার মুখের দিকে চেয়ে গাঢ়, গভীর গলায় বললে, 'যাই কেননা হই, তুমি প্রস্তুত হয়ে থেকো, কাল দুপুরে আমি আসব। দেখি কে আমাকে বাধা দেয়।'

অণুভা কী বলতে চেষ্টা করল, মুখ দিয়ে কথা ফুটল না।

'আমাদের আর বেশি সময় নেই,' হিমাদ্রি প্রবল

অস্থিরতায় ফুটতে লাগল : 'আমাকে এখুনি, এটুকু সময়ের মধ্যে সব গুছিয়ে নিতে হবে। তোমার কোনো ভয় নেই। আমি আছি, আমি আবার আসব। দাঁড়াও, একটা ইনজেকশান দিয়ে যাই।'

হিমাদ্রি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল নিচে, আর সেই মুহূর্তে অণুভার দুই চোখে অকূল, অজস্র রাত নেমে এল।

সমস্ত রাত ভেবে অণুভা শরীরে-মনে নিঃসংশয় ঠিক করে ফেলেছে সে যাবে না, কিন্তু সকালের রোদ ক্রমে-ক্রমে ঘন, কঠিন হয়ে আসতেই বালিশে সে কান পেতে রইল, কখন না-জানি হিমাদ্রি আসবে।

সে যাবে না ; কিছুতেই যেতে পারে না সে, তবু ঝিটাকে ডাকিয়ে মাথাটা ধুয়ে ফেলে ফর্সা একটা সে শাড়ি বদলে নিয়েছে। শাড়িটা এত মসমসে যে শরীরের সঙ্গে লতিয়ে লেপটে বসেনি ; কী বিশ্রী হয়ে গেছে তার শরীর ! আরশিটা পেড়ে এনে চুল-গুলির সামনেটাও সে একটু ঠিক করল, রোগে ভুগে কেমন তার মুখ এখন রেখায় ধারালো, কাতরতায়

বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। সমস্তটা কেমন ঢিলে, চোপ-সানো, অপরিচ্ছন্ন।

তাই বলে হিমাদ্রি না আসুক একথাও সে, যতক্ষণ তার চোখে আলো আছে, বিশ্বাস করতে পারছে না।

দুপুর—কতক্ষণে না-জানি দুপুর হয়! অণুভা এখন নিশ্চেতন ঘুমিয়ে পড়তে যদি পারে তো মন্দ কী! এক ঘুম পরে জেগে উঠেই সে হয়তো দেখতে পাবে, বেলাহীন, বিশাল, শাদা একটা সমুদ্রের পাড়ে সে একা বসে আছে।

কিন্তু ঘুমিয়ে পড়বে কী, জেগে থেকে হিমাদ্রিকে সে ফিরিয়ে দেবে।

কে কাকে বাঁচায়!

তার শুয়ে-থাকার জগতে সময় বলে যেন কোনো আরেকটা ভার নেই—কতক্ষণ কেটে যেতেই নড়বড়ে কাঠের সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ নির্ভুল বেজে উঠল।

মন্দিরের ঘণ্টার মতো অণুভার হৃৎপিণ্ড উঠল বেজে। অনির্বচনীয় ভয়ে সে চোখ বুজল।

কিন্তু কতক্ষণ সে আর চোখ বুজে থাকতে পারে বলো! এমন একটা আবির্ভাব সে দেখবে না?

'এই যে তুমি ঠিক তৈরি হয়ে আছ!' উদার সহাস্যতায় হিমাদ্রি তাকে অভিবাদন করলে।

সত্যি, প্রদোষ-ধূসর আকাশে যেন জ্যোতির্ময় সূর্য উঠে এসেছে। হিমাদ্রিকে কোনোদিন যেন এত সুন্দর, এত স্থির, এত বলশালী দেখায়নি। সমস্ত পাপের উপরে মহান একটি ক্ষমা, সমস্ত গ্লানির উপরে অপশোক নির্মলতা। অণুভার চোখের পলক আর পড়তে চায় না। তার মৃত্যুও কখনো এত রমণীয় নয়।

'তবে আর কী! চলো।'

কী যে বলবে সেই মুহূর্তে অণুভার সমস্ত ভাষা নীরব হয়ে গেছে।

হিমাদ্রি এগিয়ে এসে তার গায়ে সামান্য ঠেলা দিল: 'ওঠ, এমনি করে আমার দিকে চেয়ে আছ কী? বাড়িটা এখন নিঝুম, ঘুমের পাথর দিয়ে তৈরি। হ্যাঁ, বেশি দেরি করবার সময় কই।'

অণুভা যেন তার চারপাশের পরিমিতি খুঁজে পেল, অস্ফুট, আর্ত গলায় বললে, 'আমি যাব না। কেন আমি যাব ?'

'কেন তুমি যাবে মানে ?' হিমাদ্রি রৌদ্রের মতো স্পষ্ট গলায় বললে, 'আমি বলছি, তাই তুমি যাবে।'

এর উত্তরে যে কী প্রতিবাদ করা যায় অণুভা কিছু ভেবে পেল না।

কিন্তু সে-ও আজ সঙ্কল্প করে রেখেছে। তাই যথাসাধ্য দৃঢ়তা অবলম্বন করে সে বললে, 'কিন্তু আপনার সঙ্গে যে যাব আপনি আমার কে ?'

'নিজেকেই তা জিগগেস কর।' হিমাদ্রি স্পর্ধা করে বললে, 'যে আজ তোমাকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে সেই তোমার সব। আমি হচ্ছি সেই, যার কাছে তোমার ভয় নেই, সন্দেহ নেই, বিন্দুতম জিজ্ঞাসা পর্যন্ত নেই। তুমি জানো না আমি কে ?'

অণুভার সমস্ত সঙ্কল্প গেল ভেসে। ভীরু, ভেজা গলায় সে বললে, 'আমি রুগী—ঘৃণ্য, পঙ্কিল একটা রুগী, আমার ওপর আপনার এই অগাধ স্নেহ কেন ?'

'দেখ, তোমার সঙ্গেও আমার তর্ক করতে হবে, এ আমি কখনো ভাবতে পারতুম না।' হিমাদ্রি এক নিশ্বাসে সমস্ত কুয়াশা অপসারিত করে দিল, বললে, 'তুমি যে রুগী এ-কথাটা তোমার এখনই কেবল মনে হচ্ছে, কিন্তু আজকের কথা ছেড়ে দাও, যদি, মনে করো, বছর কয়েক আগে যখন তোমার সঙ্গে আমার এ-বাড়িতে ভাঙা-চোরা কতোগুলি অস্ফুট দেখা হত, তখন যদি তোমাকে আমি বিয়ে করতুম, তবে আজ তোমার এই ঘৃণ্য, পঙ্কিল রোগ দেখে তোমাকে এই বিশীর্ণ বিছানায় ফেলে রাখতে পারতুম নাকি?' হিমাদ্রি অস্থির হয়ে উঠল: 'আমরা সব সময়ে কেবল সামনের দিকেই বাঁচি না, পেছনে গিয়েও বাঁচি। আমার বিয়ের লগ্ন এখনো বয়ে যায়নি, নাও, ওঠ।'

অণুভা মূর্চ্ছার মধ্যে থেকে বললে, 'আপনি পাগল হয়েছেন?'

'এ-প্রশ্নটা তোমার বাবাও আমাকে করেছিল, কিন্তু উত্তরটা আমি তোমাকে দিচ্ছি। পাগল ছাড়া আর

কেউ কোনোদিন বড় কাজ করতে পারে না, অণুভা।'

অণুভা কী বলবে কিছু খুঁজে পেল না।

'আর ভালোবাসা জেনো মানুষের মহত্তম পাগলামি।'

হিমাদ্রি উত্তাল হেসে উঠল।

যেন এতক্ষণে অণুভা তার বলবার কথা পেয়েছে। হিমাদ্রির মুখের দিকে করুণ দুটি চোখ তুলে সে বললে, 'কিন্তু আপনি তো আমাকে ভালোবাসেন না, আমার রোগকে ভালোবাসেন।'

'তুমিও যদি আমাকে ভালবাসতে, অণু,' হিমাদ্রি তার কপালের উপর শান্ত, সস্নেহ একখানি হাত রাখল : 'তবে দেখতে পেতে, আমাকেই তুমি ভালোবাসছ না, আমার দোষ, ত্রুটি, সমস্ত অসম্পূর্ণতাকেও ভালোবাসছ।'

'কিন্তু আমি মরছি, আমি মরতে বসেছি।' অণুভা দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল।

আর হিমাদ্রি উঠল হেসে। যেন কোথাও কিছু দুঃখ নেই তেমনি উদার প্রসন্নতায় বললে, 'মরছি,

মরছি তো আমিও। প্রতিটি নিশ্বাসে আমি মরছি। সংসারে কে না মরতে বসেছে, অণুভা ?'

'তবু, আমি,' ঘৃণায় অণুভার শরীর যেন সঙ্কীর্ণ হয়ে এল : 'আমাকে নিয়ে আপনার কী হবে ?'

'তবে তুমি যদি, ধরো, সুস্থ ও সবল থাকতে, থাকত তোমার রূপ আর ঐশ্বর্য, তখন, বলো, তখনই বা তোমাকে নিয়ে আমার কী হত ?'

'তখন তো আমি বাঁচতুম।' অণুভা কান্নার মতো করে বললে।

'এখনো তুমি বাঁচবে।' হিমাদ্রি তার উপস্থিতিতে আরো উত্তপ্ত হয়ে উঠল : 'তুমি তো জানো, আমরা কখনো কাল বাঁচি না, আজ বাঁচি। আমাদের বাঁচা সময়ের স্ফীতিতে নয়, মুহূর্তের ক্ষীণায়ুতায়। তুমি তো তা জানো, তুমি তো তা জানো, অণুভা। তবে কেন আর দ্বিধা করছ ? তুমি যে এই দেয়ালের দেশ থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে উন্মুক্ত সমুদ্রের ডাকে —সেই তো তোমার বাঁচা।' হিমাদ্রি তার দিকে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে দিল : 'আর এই যে তোমাকে

আমি ডাকছি, তোমাকে নিয়ে যেতে পারছি এই বন্ধ অন্ধকূপ থেকে, এইখানে তো আমিও বাঁচলুম। অবিনশ্বর একটি মুহূর্ত—তার বেশি কী চাই?'

কান্নায় অণুভা যেন তার শরীর থেকে মুছে গেল। অন্ধ, বোবা গলায় বললে, 'না, আমি আর বাঁচতে চাই না, আমি মরবো, আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে।'

'মরে যেতে ইচ্ছে করছে?' হিমাদ্রির হৃৎপিণ্ড যেন মাটির উপর খসে পড়ল।

'হ্যাঁ, জীবনে এমন একেকটা মুহূর্ত আছে,' অণুভার আত্মা যেন কথা কয়ে উঠল : 'যার ওপারে মানুষের আর বাঁচা উচিত নয়। সেই মুহূর্তেই তার অসহ্য অবসান।'

'ভয় কী, সেই মুহূর্তকে আমরা মরতে দেব না। তুমি এস।'

'কিন্তু কেন, কী দেখলেন আপনি আমার মধ্যে, কেন আপনি এই হাড়ের বোঝাটা সমস্ত জীবন বয়ে বেড়াবেন?' অণুভা চোখ খুলল, কৃতজ্ঞতায় তা

কানায়-কানায় ভরা ; বললে, 'কোন সুখে আপনি বিপন্ন করবেন নিজেকে ?'

'তোমাকে আর বিপন্ন করতে পারব না বলে।' হিমাদ্রি এবার স্পষ্ট তার হাত ধরল : 'তোমার এই শুকনো হাড় যে একদিন আমার হাতে রূপকথার সেই সোনার কাঠি হয়ে উঠবে, সেই আমার সুখ, তোমার মাঝে সেই আমার উদ্ভাবন।'

নিরুচ্চার, নিবিড় অনুভূতিতে অণুভা ঘনীভূত হয়ে রইল।

'তুমিই তো বলেছ,' হিমাদ্রি বললে, 'আমি যখন আসি, বসি এসে তোমার কাছে, তোমার অসুখ তখন কমে যায়, চারদিকে তোমার খুশির বাতাস বইতে থাকে, মনে হয় তুমি যেন এখুনি সিঁড়ি ভেঙে রাস্তায় নেমে যেতে পারবে। তোমাকে বলতেই বা হবে কেন ? আমি বুঝতে পারি না ? আমি দেখতে পারছি না আজ স্বচক্ষে, যে, তুমি যাবে শুনে তোমার শরীর কেমন সবুজ একটি পাতার মতো দুলে উঠেছে, তোমার শুকনো চামড়ায় কেমন

এসেছে একটা রক্তিমা, চারদিকের এই দেয়াল গেছে সব দিগন্তে মিলিয়ে। সে তো তুমি আমাকে চাও, আমাকে ভালোবাসো বলে।'

'তারি জন্যেই তো,' অণুভাও আর মুখ ঝেঁপে থাকবে না, মুখোমুখি প্রখর গলায় বলবে, 'তারি জন্যেই তো তোমাকে আবার রুগ্ন করতে চাই না।'

'আমি? আমি তোমার ডাক্তার।'

'কিন্তু এত বড়ো একটা ডাক্তার হয়ে এই একটা ক্ষয়-ক্ষীণ কুৎসিত মেয়েকে ভালোবাসা তোমার অস্বাস্থ্য নয়?'

'আমাদের, মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে আর বড়াই কোরো না, অণুভা।' হিমাদ্রি তাকে সামান্য একটু আকর্ষণ করল: 'তোমাকে বলতে বাধা নেই, সমস্তটাই আমার ডাক্তার নয়। ডাক্তার আমি তো তোমার শুধু খানিক্ষণের জন্যে ছিলুম, কিন্তু এখন থেকে দিন আর রাত্রি, সময় আর অ-সময়—কোনো কিছুর মধ্যে আর বিরোধ থাকবে না, ব্যবধান থাকবে না। তুমি চলে এসো।'

তার দুই চোখে বিশাল অসহায়তা নিয়ে অণুভা বললে, 'আমার ভারি ভয় করছে।'

'ভয় ? কাকে ভয় ? আমাকে ?'

'না, না, তোমাকে নয়,' অণুভা নিজের জোরেই আস্তে-আস্তে উঠে বসল : 'কিন্তু এ আমি কোথায় চলেছি ?'

'তুমি তো একদিন মরতেই চলেছিলে অণু,' হিমাদ্রি গাঢ় গলায় বললে, 'তোমার তবে ভয় কী !'

'না, ভয় কি, কিন্তু এ যে আমার মৃত্যুর চেয়েও অনির্বচনীয়।'

আশ্চর্য, আস্তে-আস্তে অণুভা তার সেই দুর্বল, আঁকা-বাঁকা কৃশতায় উঠে দাঁড়াল। ক্ষিপ্র হাতে হিমাদ্রি গেল তাকে সাহায্য করতে।

হেসে, আস্তে একটু তাকে বাধা দিয়ে অণুভা বললে, 'না, এখন আমার তোমাকে সাহায্য করবার কথা। তুমি জানো না, আমি কতটা আজ ভালো হয়ে গেছি।'

অণুভা উৎসুক চোখে কী যেন খুঁজতে লাগল।

হিমাদ্রি ব্যস্ত হয়ে বললে, 'তোমার কিছু নিতে হবে না।'

'কিন্তু,' অণুভা চমৎকার হেসে ফেলল, 'তক্তপোশের নিচে ঐ আমার জুতো-জোড়াটা আছে, নিচু হয়ে দয়া করে যদি এগিয়ে দাও। খালি পায়ে যাব কি করে?'

নিচু হয়েই হিমাদ্রিকে জুতো-জোড়াটা এগিয়ে দিতে হল।

বললে, 'তুমি পায়ে হেঁটে নেমে যেতে পারবে?'

'পারব। তুমি শুধু হাতটা আমার ধরো।'

'দেখো, আস্তে।' হিমাদ্রি বললে।

অণুভা এবার রীতিমত শব্দ করে হেসে উঠল: 'যেতেই যখন পারছি, তখন আর আস্তে যেতে পারছি না।'

[সমাপ্ত]